

নারায়ণ সান্যাল

ষড়ানন রবীন্দ্রমূর্তির কাঁটা



ষড়ানন রবীন্দ্রমূর্তির কাঁটা

চন্দ্রশেখর বসু

কুন্ড ব্যাক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

যড়ানন রবীন্দ্রমূর্তির কাঁটা
ডয়েলিয়ান 'দ্য সিক্স নেপোলিয়নস্'কে 'হিন্দের বন্দী'
করার প্রচেষ্টা

আপনারা হয়তো আমাকে চেনেন না, তাই প্রথমে নিজের পরিচয়টা দিই। আমার নাম কৌশিক মিত্র। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই. পাস করেছিলাম। কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং পেশাটা আমার পোষালো না। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে খুলে বসেছিলাম একটা পেশাদারী গোয়েন্দা সংস্থা ‘সুকৌশলী’।

আমাদের অফিস আর আস্তানা হচ্ছে নিউ আলিপুর—বাসুমামার বাড়ির একতলার একটা অংশে। আমরা একসঙ্গেই থাকি। এক হেঁসেলে রান্না হয়। বাসুমামার পুরো নাম পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল। কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা ক্রিমিনাল সাইড ব্যারিস্টার। তবে আদালতের চৌহদ্দির মধ্যেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন না। নির্দোষ আসামীকে খালাস করানোতেই তাঁর কাজ শেষ হয় না। আসল অপরাধীকে চিহ্নিত না করা পর্যন্ত যেন তাঁর শান্তি নেই। আমরা স্বামীস্ত্রীতে তাঁকে গোয়েন্দা-কাজে সাহায্য করি। মামুর বয়স প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই, ফলে গোয়েন্দা হিসাবে ছোটোছুটির কাজগুলো আমাদেরই করতে হয়।

সেদিন ছিল রবিবার। দুপুরে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল নিখিল দাশ আর তার স্ত্রী কাকলির। ওরা দুজনেই বাসু-মামুর প্রিয়পাত্র। নিখিল আমারই বয়েসী তবে ক্যালকাটা পুলিশে অনেকটা উপরে উঠে গেছে ওর কর্মদক্ষতার গুণে। এখন সে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট।

বাইরের ঘরে বসে আমরা গল্পগুজব করছি। ভিতরে আমার স্ত্রী সুজাতা আর কাজের মেয়ে ফুটকি রান্নাবান্নায় ব্যস্ত।

কথাপ্রসঙ্গে নিখিল বলল, কাল একটা মিস্টিরিয়াস্ ব্যাপার হয়েছে, স্যার। আমি যে বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকি তার একতলায় বাস করেন মিস্টার ভাণ্ডারী। উত্তরপ্রদেশের মানুষ। ব্যবসায়ী। নিউমার্কেটে ওঁর একটা ‘কিউরিওশপ’ আছে। নানান থ্রেজেন্টেশানের জিনিস দিয়ে ঠাসা। ওঁর একজন সহকারী আছে। সে গিয়ে সকালে দোকান খোলে। ভাণ্ডারী যান বিকেলের দিকে। কাল সন্ধ্যায় ওঁর একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। রাত

তখন পৌনে নয়টা। দোকান বন্ধ করছেন। অনেক দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। ইঠাৎ একটি খদ্দের এলেন। একাই। বছর চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। এসেই জানতে চাইলেন, ‘রবীন্দ্রনাথের কোনো প্লাস্টার অব প্যারিসের মূর্তি আছে? শুধু বাস্ট—এই সাত-আট-ইঞ্চি খাড়াই?’

ভাগুরী বসেছিলেন দোকানের ভিতরে, ক্যাশ-কাউন্টারে। ওঁর সহকারী বললে, ‘আছে। দাঁড়ান দেখাই।’

গ্লাস-কেস থেকে ওইরকম একটা মূর্তি বার করে টেবিলে রাখল। ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, কত দাম এটার?

—পঁয়তাল্লিশ টাকা।

উনি পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করতে করতে বললেন, এই মূর্তির জোড়া আছে?

—জোড়া? না, জোড়া নেই। এই মাপের তিনটে এসেছিল। দুটো বিক্রি হয়ে গেছে। এই একটাই পড়ে আছে। এর চেয়ে ছোট মাপের আছে। দেখাব?

—না। ছোটবড় হলে চলবে না। জোড়া চাই। ওরা দু-বোনই পিঠোপিঠি। দুজনেই রবীন্দ্রসংগীত শিখছে। ছোট-বড় নিয়ে গেলে বাড়িতে অশান্তি হবে।

ভাগুরী এইসময় পিছন থেকে বলে ওঠেন, কেন স্যার? ওরা তো দুই যমজ বোন নয়। যে বড়, সে বড়টা নেবে। যে ছোট—

ভদ্রলোক সে কথায় কর্ণপাত না করে সেলস্‌ম্যানকে জিজ্ঞেস করেন, সেম-সাইজের আর দুটো কবে বিক্রি হয়েছে?

ভাগুরী বললেন, মাস ছয়েক আগে। দুটোই ডাক্তার দাশগুপ্ত কিনে নিয়ে গেছেন। তাঁর অবশ্য যমজ মেয়ে নেই।

—তাহলে তিনি জোড়া কিনলেন কেন?

—তা বলতে পারব না। বড়লোকের খেয়াল আর কী! শুনেছি, একটা ওঁর চেম্বারে রাখা আছে, একটা বাড়িতে।

—‘ডক্টর দাশগুপ্ত’ মানে আমাদের গড়িয়াহাটার অমল দাশগুপ্ত? আই, স্পেশালিস্ট?

—আজ্ঞে না, যোধপুর পার্কের পি. এন. দাশগুপ্ত, কার্ডিওলজিস্ট। কিন্তু তিনি আপনাকে সেকেন্ড-হ্যান্ডে মূর্তি দুটির কোনো একটা বেচবেন বলে মনে হয় না। আপনার যদি দরকার থাকে, অর্ডার দিয়ে যান, দিন সাতেকের ভিতর ঘূর্ণি থেকে আনিয়ে দেব।

—ঘূর্ণি? ঘূর্ণি কোথায়?

—নদীয়া কখনগরে। অরিজিনাল মূর্তিটা বিখ্যাত মৃৎশিল্পী কার্তিক পালের গড়া। ওই যাঁর তৈরি রবীন্দ্রনাথের বিরাট মূর্তি আছে রবীন্দ্রসদনে। দিন সাতেক পরে হলে চলবে আপনার?

—না, থাক।

পঁয়তাল্লিশ টাকা দাম মিটিয়ে ভদ্রলোকের মূর্তিটি বগলে করে চলে গেলেন।

মামু গল্পটা আদ্যোপান্ত শুনে বললেন, এর মধ্যে মিস্টারিয়াস্ কী দেখলে?

—না, স্যার রহস্যটা এর পরবর্তী পর্যায়ে। সারা দিনের হিসেবপত্র মিটিয়ে রাত দশটা নাগাদ যখন ভাণ্ডারী বাড়ি ফিরে আসছেন তখন। ওঁর গাড়িটা পার্ক করা ছিল লিভসে স্ট্রিটের একটা পরিচিত লোকের গ্যারেজে। রোজই তাই থাকে। গাড়িটা বার করতে গিয়ে রাস্তার উপর সাদা-মতো কী যেন পড়ে আছে দেখলেন। ভাণ্ডারী কৌতূহলী হয়ে তুলে দেখলেন—রবীন্দ্রনাথের সেই প্লাস্টারের মূর্তিটা।

আমি বলি, হয়তো ভদ্রলোকের হাত ফস্কে পড়ে গেছে।

নিখিল বলে, না। পথ-চলতি মানুষের হাত থেকে—মানে মিটারখানেক উচ্চতা থেকে—ওইরকম একটা মূর্তি ফুটপাতে পড়ে গেলে তা দু-তিন-চার টুকরো হতে পারে। এক্ষেত্রে তা হয়নি। পঞ্চাশ-ষাট টুকরো হয়েছে। কে-যেন মূর্তিটাকে গুঁড়ো করেছে। পাড়া তখন শুনসান হয়ে এসেছে—অন্তত ওই গলিটায়।

মামু বললেন, ইয়েস! গল্পটা এতক্ষণে রহস্যঘন হয়ে উঠেছে বটে।

আমি বললাম, কিন্তু রহস্যটার দাম মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা, মামু!

মামু বললেন, তাতে কী? ‘ছাই’-এর দাম তো তারও কম—

—ছাই? কোন ছাই?

—কথায় বলে না, ‘যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার—’

আমি টপ করে পাদপূরণ করি, হ্যাঁ জানি : ‘হারানো রতন’ অথবা ‘অ্যাটম বোম্ বানানোর গোপন ফর্মুলা’।

নিখিল হাসতে থাকে। মামু পকেট থেকে পাইপ বার করেন। ঠিক তখনই মামি এসে পড়েন ভিতর থেকে। বলেন, এখন আবার পাইপ ধরিও না। ওরা ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে।



ঘটনাটা মিস্টিরিয়াস—অস্বীকার করব না। কিন্তু মামু যতই বিরুদ্ধ যুক্তি দেখান না কেন : এটা সামান্য ব্যাপার। পঁয়তাল্লিশ টাকার একটি মামুলি প্লাস্টারের মূর্তি।

কিন্তু ব্যাপারটা আবার সিরিয়াস হয়ে উঠল পরদিন, সোমবার বিকালে। নিখিল টেলিফোন করে মামুকে জানানো, স্যার, কাল সকালে যে মিস্টিরিয়াস ঘটনার কথাটা বলেছিলাম চব্বিশ ঘন্টা না যেতেই তা ‘মিস্টিরিয়াসার’ থেকে ‘মিস্টিরিয়াসার’ হয়ে উঠেছে।

মামু বললেন, কী ব্যাপার? হঠাৎ তুমি লুইস ক্যারলের ‘কিউরিঅসার’ থেকে ‘কিউরিঅসার’-এর মতো ব্যাকরণ বহির্ভূত শব্দ প্রয়োগ করছ কেন? কী ঘটেছে?

নিখিল টেলিফোনেই ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে জানাল—

গতকাল গভীর রাতে যোধপুর পার্কে ডক্টর দাশগুপ্তের বাড়িতে একজন চোর ঢুকেছিল। উনি দোতলায় থাকেন, ওঁর একতলার বৈঠকখানা ঘরে খুটখাট শব্দ হওয়ায় ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। রাত তখন দুটো। উনি উঠে সুইচ জ্বালেন। বাতি জ্বলে না। তখন নাকি লোডশেডিং চলছিল। খুঁজে পেতে একটা টর্চ নিয়ে বৈঠকখানায় নেমে আসেন। দেখেন, কে বা কারা জানলার কাচ ভেঙে ছিটকিনি খুলে ইতিপূর্বেই ওঁর ঘরে ঢুকেছিল। ঘরে জিনিসপত্র তছনছ হয়ে আছে। আলো জ্বলার পর উনি ভালো করে খুঁজে দেখেন—না, কিছুই চুরি যায়নি। টি.ভি, রিমোট কন্ট্রোল, টেবিল ক্লক, পিতলের বড় ফুলদানি সবই ঠিক ঠিক জায়গায় আছে। ওঁর সেক্রেটারিয়াট টেবিলের খোলা ড্রয়ারে টাইটান হাতঘড়ি, এবং টাকা-পয়সাও কিছু খোয়া যায়নি। শুধুমাত্র টেবিলের উপর থেকে একটি রবীন্দ্রনাথের মূর্তি অপসারিত হয়েছে। ডক্টর দাশগুপ্ত এ ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেন না।

রহস্যটা আরও ঘনীভূত হয়ে গেল যখন উনি বেলা আটটার সময় ওঁর চেম্বারে যাবার জন্যে গাড়ি বার করতে গেলেন। আশ্চর্য! গ্যারেজের সামনে পড়ে আছে ওঁর সেই মূর্তিটা—টুকরো টুকরো অবস্থায়। এ কী কাণ্ড!

ডক্টর দাশগুপ্ত রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্র রচনাবলী ওঁর আলমারিতে সাজানো। অবসর পেলেই তা পড়েন। রবীন্দ্রসংগীতও উনি খুব ভালোবাসেন। কণিকা, সুচিত্রা, জর্জদার অনেক ক্যাসেট আছে ওঁর সঞ্চলনে। রোজই কাজের ফাঁকে উনি কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শোনেন। নিউ মার্কেটের একটি দোকান থেকে এক জোড়া সাদা প্লাস্টার অব প্যারিসের মূর্তি কিনে এনেছিলেন। একটা আছে ওঁর চেম্বারে। রাসবিহারী অ্যাভেন্যুতে। একটা ছিল বাড়ির বৈঠকখানায়। কে এভাবে একটা চুরি করল, আর করলই যদি, তাহলে সেটাকে এভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করল কেন?

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে উনি চলে গেলেন হাসপাতালে। সেখানে সকাল ন-টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত উনি কার্ডিয়োলজি বিভাগে আউটডোরে রুগী দেখেন। সে কাজ সেরে বারোটা নাগাদ চলে আসেন রাসবিহারীর চেম্বারে। এখানে তিনি বেলা দুটো পর্যন্ত রুগী দেখেন। কখনো কখনো তিনটেও বেজে যায়।

সেদিন চেম্বারে গিয়ে শোনেন, গতকাল শেষ রাত্রে ওঁর চেম্বারে নাকি চোর ঢুকেছিল। দারোয়ান তাকে ধরতে পারেনি। তবে তাড়া করায় লোকটা বিশেষ কিছু নিতেও পারেনি। মোটর সাইকেলে চেপে পালিয়ে যায়। ওঁর কিছু দামী যন্ত্রপাতি ছিল সেঘরে। দারোয়ান বলল, নেহী সাব ম্যয়নে সোচ সমঝকে দেখা হয়। উহ্ বদমাস কুছ চোরানে নেহী সেকা।

ডাক্তারবাবু বলেন, লেकिन মেজ পর রবীন্দ্রনাথজীকি যো স্ট্যাচু থা—?

দারোয়ান অবাক বিস্ময়ে দেখতে পায়—কথাটা সত্যি। টেবিলের উপর সেই সাদা মূর্তিটা নেই। অনেক খোঁজখবর করা হল—না! সে বস্তুটা বেমালুম না-পাত্তা।

ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে নিখিল দাশের আলাপ ছিল। দুটি ঘটনাস্থল, অর্থাৎ ওঁর বাড়ি ও চেম্বার—দুটি ভিন্ন ভিন্ন থানার এজিয়ারে। তাই উনি দুটি থানায় পৃথক পৃথক ভাবে ফোন না করে এই রহস্যময় ঘটনার কথাটা জানিয়েছেন লালবাজারে—খোদ দাশ সাহেবকে।

মামু বলেন, ঘটনাটা ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে হে। একটা লোক এভাবে ক্রমাগত রবীন্দ্রনাথের মূর্তিভাঙার ব্যাপারে মরিয়া হয়ে উঠছে কেন? রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অজাতশত্রু। প্রথম জীবনে হয়তো তাঁর কিছু শত্রু ছিল, যাঁরা ওঁকে ‘পায়রা কবি’ বলে ব্যঙ্গ করেছিল। পরবর্তীকালেও কোনো কোনো রাজনীতি ব্যবসায়ী ওঁকে বুর্জোয়া কবি বলে অসম্মান করেছে কিন্তু তাদের কোনো চ্যালা চামুণ্ডা এ কাজ করবে না। তোমরা এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা নিচ্ছ?

নিখিল বলে, দেখুন স্যার, সারা দেশে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য মূর্তি আছে। আমরা কী করে পাগলটাকে ঠেকাবো বলুন? তবে লোকটা এবার হয়তো রবীন্দ্রসদনের ওই বিরাট মূর্তিটাকে আক্রমণ করতে পারে। তাই আমরা সেখানে পাহারা বসিয়েছি।

মামু বলেন, বেশ করেছে। কিন্তু লোকটা তো শুধু একটা বিশেষ মাপের মিনিয়েচার মূর্তিই ভাঙছে। মিস্টার ভাণ্ডারীর সেল্‌সম্যান যখন অন্য সাইজের মূর্তি দেখাবার প্রস্তাব করল তখন তো সে রাজি হয়নি।

—তা ঠিক! আপনি কী পরামর্শ দেন?

—আমি কী পরামর্শ দেব? এটা আইনের এজ্জিয়ারে এসেছে বটে কিন্তু আদালতের এজ্জিয়ারে তো এখনো আসেনি। তুমি বরং ‘সুকৌশলী’-র সঙ্গে পরামর্শ করো।

এরপর নিখিল আমাকে ফোন করে।

আদ্যোপান্ত শুনে আমি বলি, তোমরা কি ‘সুকৌশলী’কে অফিশিয়ালি এনগেজ করছ?

—তাই করছি, কৌশিক। তোমাদের বিল এবং এক্সপেন্সেস আমরা মেটাব।

—ক্যালকাটা পুলিশ?

—না, কৌশিক, সমস্ত খরচ ডক্টর দাশগুপ্তের। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এ বর্বরতার প্রতিশোধ নিতে চান। সামান্য খরচ করলেই তিনি আর এক জোড়া মূর্তি ক্রয় করতে পারেন। কিন্তু তাতে তিনি তৃপ্ত নন। তাঁর হেপাজতে থাকা রবীন্দ্রমূর্তি দুটিকে যে লোকটা এ-ভাবে ভেঙেছে তাকে শাস্তি দিতে ডক্টর দাশগুপ্ত বদ্ধপরিকর। বস্তুত তিনিই আমার মারফতে

তোমাদের এনগেজ করছেন। তুমি যদি চাও তো তিনি নিজেই গিয়ে কথা বলবেন তোমাদের অফিসে।

আমি বলি, না। তিনি ব্যস্ত ডাক্তার মানুষ। এসব ফর্ম্যালিটিতে যে সময়টা তাঁর নষ্ট হবে হয়তো সেই সময়টা অন্যত্র ব্যয় করলে একটা মুমূর্ষু হার্ট-পেশেন্ট প্রাণে বেঁচে যাবে। তাঁর টেলিফোন নাম্বারটা দাও,—বাড়ির ও চেস্বারের। আমি পার্সোনালি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আমি আর সুজাতা টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে প্রথমে দেখা করলাম ডঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে। তিনি বললেন, দেখুন মিস্টার মিত্র, একদিক থেকে ব্যাপারটা সামান্য। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী আকাশচুম্বী মহিমা এতে কিছুই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, কিন্তু এটা ব্যক্তিগতভাবে আমার আত্মমর্যাদায় ঘা দিচ্ছে। আমি মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নই, কিন্তু আমার হেপাজতে-থাকা গুরুদেবের মূর্তি দুটি এভাবে নষ্ট হওয়াতে আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করছি।

আমি বলি, দেখুন ডক্টর দাশগুপ্ত, আমরা কোনো কিছু কূলকিনারা করতে পারিনি। বদমায়েশটাকে যে ধরতে পারব এমন কোনো গ্যারান্টিও আমরা দিতে পারছি না। তবে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। এখন বলুন, আমরা কতদূর খরচ করতে পারি?

—আপাতত আপনাদের খরচপাতি হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা। সম্মানদক্ষিণাটা আপনারাই ধার্য করবেন আপনাদের সাফল্যের বিচারে। ডঃ দাশগুপ্ত একটি খামে পাঁচ হাজার টাকা আমাদের হস্তান্তর করলেন। গাড়িতে করে ওঁর চেস্বার ও বৈঠকখানা দেখালেন। যেখানে জিনিসদুটি চুরি হয়েছে। বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। চূর্ণ হওয়া মূর্তিটি দেখলাম। তাতেও কোনো সূত্র নেই।

এরপর বিকেলের দিকে নিউমার্কেটে ভাণ্ডারী সাহেবের দোকানে হানা দিলাম। তিনিও নতুন কোনো সূত্রের সন্ধান দিতে পারলেন না। তাঁর সঙ্গে ওই অচেনা খদ্দেরের যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তাও দ্বিতীয়বার শুনলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম সেই লোকটির আকৃতি সম্বন্ধে। উনি যা বললেন তা সংক্ষেপে এই রকম:

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পরনে ছিল জিন্সের প্যান্ট ও বাদামী হাফশার্ট। চোখে একটা কালো চশমা, গোঁফ-দাড়ি দুইই আছে। হাতে

একটা কালো ব্যাগ। আমি জানতে চাই, রাত নয়টার সময় তিনি চোখে কালো গগলিস পরে ঘুরছিলেন কেন? কী মনে হল আপনার? লোকটা কি আত্মগোপন করতে চাইছিল? ছদ্মবেশে এসেছিল?

ভদ্রলোক একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তখন তা আমার মনে হয়নি। এখন আপনি বলাতে মনে হচ্ছে ওর গোঁফদাড়িও নকল। হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে যে নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে এসেছিল। যাতে তার আসল চেহারাটা আমি দেখতে না পাই।

—লোকটা বেঁটে না লম্বা? ফর্সা না কালো?

—মাঝারি হাইট। পাঁচ ছয়-সাত হবে। রঙ কালো।

রাতে ফিরে এসে সব তথ্য বাসু-মামুকে জানালাম। পারলে হয়তো তিনিই আন্দাজ করতে পারবেন কেন লোকটা এমন অদ্ভুত আচরণ করছে।

মামু বললেন, এক জাতের লোক আছে তাদের বলে monomaniac—ফরাসি ভাষায় রোগটার নাম ‘idee fixe’। তাদের কোনো একটি বিষয়ে ‘idee fixe’ থাকে। কেউ হয়তো বেড়াল সহ্য করতে পারে না, দেখলেই মারতে যায়; কেউ হয়তো শিবলিঙ্গ সহ্য করতে পারে না, দেখলেই ভাঙার জন্য তার হাত নিশপিশ করে। আবার কেউবা ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে—গলা টিপে মারতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এটা সে জাতীয় ‘ফিক্সেশন’ নয়!

আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, লোকটা ‘ক্লিপটোম্যানিয়াক’ নয় তো?

—না, না। ক্লিপটোম্যানিয়া একটা মনের অসুখ। ‘চৌর্য-প্রবণতা’! ওই অসুখে যারা ভোগে তারা ‘কী’ চুরি করছে তার বাছবিচার করে না। চোরাই মালটা দামি সোনার গহনা, ঘড়ি, আংটি, বই বা সামান্য প্লাস্টিকের চিরুনি—যা খুশি হতে পারে। জিনিসটার প্রতি রোগীর বস্তুত কোনো সত্যিকারের লোভ নেই। চুরি করাতেই তার অবচেতন মন খুশি। ফাঁকা ঘর, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না—ব্যস! ও কিছু একটা হাতিয়ে নেয়। সাময়িক লোভে জিনিসটা নিয়ে পালায়। পরে যখন বোঝে যে, সে চুরি করেছে, তখন আপসোস করে।

আমি বললাম, এ লোকটাও হয়তো পরে অনুতপ্ত হয়েছে বলে মূর্তিটা দু-দুবার টুকরো টুকরো করেছে।

—না, কৌশিক! ক্রিপটোম্যানিয়ার রুগী কখনো একই জাতের জিনিস খুঁজে খুঁজে চুরি করতে যায় না। সে ছদ্মবেশ পরে আসে না। আর দেখো, প্রথমবার তো সে চুরি করেনি। নগদ পঁয়তাল্লিশ টাকা খরচ করে মূর্তিটা কিনে চুরমার করেছে!

—তাহলে এটা কী ‘কেস’?

মামু বললেন, আমি জানি না কৌশিক, আমাদের হাতে যথেষ্ট তথ্য নেই এখনো। লেটস্ ওয়েট অ্যান্ড সি। লোকটা আরও কিছু অপকর্ম করে কি না।

—আপনার কি ধারণা এটা ‘সাইকোলজিক্যাল’ কেস? মানে লোকটা কি সেয়ানা-পাগল?

—আগেই তো বলেছি : আমি জানি না। আমাদের এখন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। দাবার ছকে গুটিগুলো আর দু-চার চাল এগিয়ে যাক।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। পরদিনই সকালে আমরা সবাই প্রাতরাশ খেতে বসেছি ডাইনিং টেবিলে। মামু, মামিমা আর আমি সস্ত্রীক, সকন্যা। বিশেষ, আমাদের কাজের লোক, রান্নাঘর থেকে গরমাগরম পরোটা সরবরাহ করছে। এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা। বিশেষ মোবাইল ফোনটা বাড়িয়ে ধরে মামুকে বলল, আপনার।

মামু ফোনটার শ্রবণপ্রাপ্তে কিছু শুনে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে নিখিল, তুমি কখন বের হচ্ছ?... না, আমাদের পিক-আপ করতে হবে না, ঠিকানাটা বলো? আমরা নিজেরাই চলে যাচ্ছি...

সুজাতা একটা নোট বই আর ডট পেন বাগিয়ে ধরে। মামু গ্রহণ করেন না। বলেন, হ্যাঁ, পাঁচ-নম্বর ট্যাক্সের অবস্থানটা আমি জানি। ওখানেই যেন তোমার লোক অপেক্ষা করে। আমাদের নম্বর তো জানোই। ও. কে। ... ইন হাফ্ অ্যান আওয়ার।

টেলিফোনটা অফ করে দিতেই বলি, আধঘন্টায় তৈরি হয়ে সল্ট লেক-এ কি পৌঁছনো যাবে?

মামু প্রতিপ্রশ্ন করল, কী করে বুঝলে রাদেভুঁটা সল্টলেক?

—ইনটুইশান!

—যু আর কারেক্ট। উঠে পড়ো, দেরি করা চলবে না।

তারপর মামির দিকে ফিরে বলেন, সরি রানু, আজ একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার আনন্দটা উপভোগ করা বরাতে নেই।

মামি বলেন, ব্রেকফাস্টে তো ব্রেক পড়ল, লাঞ্চ কি দুজনে বাড়িতে ফিরে এসে খাবে?

—এখনি কী করে বলি? এইমাত্র শুনলাম সল্টলেকে পাঁচ-নম্বর ট্যাক্সের কাছে একটা লোক খুন হয়েছে। সে লোকটা পুরুষ কি স্ত্রী, বুড়ো কি বাচ্চা তাও জানি না। এ ক্ষেত্রে...

—ঠিক আছে। সময় মতো বাড়ির কথা মনে পড়লে বাড়িতে একটা ফোন করে দিও, লাঞ্চ না হোক ডিনারটা একসঙ্গে বসে খাবে কি না।

পাঁচ নম্বর ট্যাক্সের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল একটা পুলিশ জিপ। আমাদের ফিয়াট গাড়িটা তার পিছনে পার্ক করলাম। গাড়ি থেকে নেমে এল একজন ইন্সপেক্টর। মামুকে নমস্কার করে বললে, আপনি আমাকে চেনেন না স্যার। আমার নাম কাসেম চৌধুরী। নর্থবেঙ্গল থেকে কিছুদিন আগে ক্যালকাটা পুলিশের হোমিসাইডে বদলি হয়ে এসেছি। আসুন, আপনারা আমার গাড়ির পিছন পিছন। কাছেই ঘটনাস্থল।

দু-তিনটে বাঁক ঘুরে অকুস্থলে উপনীত হওয়া গেল। একতলা একটা বাড়ি। আন্ডার কনস্ট্রাকশন। দোতলার ছাদ থেকে আর. সি. কলমে ছড়গুলো ভয়ে জড়াজড়ি হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

একপাশে একটা কংক্রিট-মিস্ত্রার। ইট-বালি-পাথরকুচির স্তুপ। বাড়ির সামনে একটা জটলা। একখানা অ্যান্ডুলেসও দাঁড়িয়ে আছে। কম্পটেবল কৌতূহলী প্রতিবেশীদের দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

আমাদের দুখানি গাড়ি এসে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে এগিয়ে এল নিখিল আমাদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসাল। গৃহস্বামী অরূপ বসু আপ্যায়ন করতে এগিয়ে এলেন। বাসু বললেন, এবার বলো, নিখিল।

নিখিল রাজি হল না। বললে, অরূপবাবুর মুখ থেকে সরাসরি শুনুন বরং।

গৃহস্বামী বললেন, তার আগে বলুন স্যার; চা-খাবেন, না কফি?

মামু বিরক্ত হয়ে বললেন, ওসব ফর্ম্যালিটির সময় এখন নয়। তাছাড়া

আমরা ব্রেকফাস্ট করেই এসেছি। আপনি নিশ্চয় পুলিশকে এতক্ষণে একটা জবানবন্দি দিয়েছেন। সেটা পরে দেখব। আপাতত আপনি বলুন—কে খুন হয়েছে? কোথায় খুন হয়েছে? আপনি প্রথম কখন জানতে পারলেন?

অরূপ বসলেন একটা সোফায়। বললেন, কে খুন হয়েছে জানি না। বেগানা লোকটা মরে পড়েছিল আমার বাড়ির দোরগোড়ায়। আর আমি প্রথম তাকে দেখি রাত সাড়ে তিনটেয়।

—এবার একটু বিস্তারিত করে বলুন।

অরূপবাবু যা বললেন তা এই রকম : এ বাড়িটার একতলা মোটামুটি বাসোপযোগী হয়েছে। উনি সপরিবার—মানে স্বামী-স্ত্রী ও একটি বাচ্চা, —এই এক তলাতেই থাকেন। দোতলায় কাজ হচ্ছে। উনিই মালিক। একটি সওদাগরী অফিসে কাজ করেন। একতলাটা তিন-কামরার। পিছনের দক্ষিণদিকের ঘরটা শয়নকক্ষ। প্রতিদিনের মতো কাল রাত্রেও ওঁরা সে ঘরেই শুয়েছিলেন। রাত তিনটে নাগাদ একটা খুটখাট শব্দে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। ওঁর মনে হয়, শব্দটা বাইরের ঘর থেকে আসছে। বাইরের ঘরে দামী কিছু নেই। তবে, তার পাশেই সিঁড়িঘরের নিচে থাক দিয়ে রাখা আছে সিমেন্টের ব্যাগ। উনি উঠে পড়েন। বাতিটা জ্বালেন; সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে ধূপধাপ শব্দ শুরু হল। ঘর থেকে বার হতে গিয়ে দেখেন ওঁর শয়নকক্ষের বাইরের দিকে ছড়কোটা কেউ আটকে দিয়েছে। অর্থাৎ চোর চুরি করার আগে গৃহস্বামীকে গৃহবন্দি করে ফেলেছে। অরূপবাবু চার সে. মি. ব্যাসের হাত-খানেক লম্বা একটা জলের গ্যালভানাইজড পাইপ—যেটা থাক দেওয়া মালপত্রের মধ্যে ঘরেই ছিল—তুলে নিলেন। অ্যাটাচড বাথরুমের মেথর-খাটা দরজাটা দিয়ে বাড়ির বাইরে বার হয়ে আসেন। ঠিক তখনই একটা ফায়ারিঙের শব্দ হয়। পিস্তল অথবা রিভলভারের। উনি থমকে যান। কারণ উনি নিরস্ত্র। গ্যালভানাইজড পাইপ নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রধারীর মোকাবিলা করা যায় না। তারপরেই শুনতে পান কিছু পদশব্দ এবং একটু পরেই একটা মোটর সাইকেলের স্টার্ট নেবার আওয়াজ। লোকটা মূহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। পাড়াটা আবার শুনসান হয়ে যায়। পাশের বাড়িতে আলো জ্বলে ওঠে। বোধকরি পিস্তলের শব্দে সে বাড়ির লোকজনেরও ঘুম ভেঙেছে। অরূপবাবু এবার এগিয়ে এসে দেখেন তাঁর দোরগোড়ায় মরে পড়ে আছে একটা বেগানা লোক। তার পাশে একটা

ভোজালি। বক্তৃতা। পরনে ময়লা পায়জামা, উর্ধ্বাঙ্গে তাম্বিমালা একটা হাফ পাঞ্জাবি। লোকটার বোধহয় বুকে লেগেছিল গুলিটা। চিত হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে এলাকাটা। প্রতিবেশী সন্তোষবাবু জানলা দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী হল বোস-সাহেব? শব্দটা কীসের? উনি তাঁকে নেমে আসতে বলেন। মৃতদেহটাকে ওঁরা নাড়াচাড়া করেন না। সোজা লালবাজারে ফোন করে দেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পুলিশের জিপে এসে যায় ইন্সপেক্টর কাসেম চৌধুরী। ইতিমধ্যে খবর রটে গেছে। লোকজন জমায়েত হতে শুরু করেছে।

বাসুমামু নিখিলকে প্রশ্ন করেন, ডেড বডিটা কোথায়?

—অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আপনি এসে দেখা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছি।

—কেউ শনাক্ত করতে পেরেছে?

—না, এ পাড়ার কেউ চেনে না। তবে ওর পকেট থেকে বার হয়েছে একটা ইস্টার্ন রেলওয়ের মাস্তুলি টিকিট। ফটো সাঁটা। ওরই মাস্তুলি। লোকটার নাম অনাথ নস্কর। ঠিকানা জয়নগরের।

আরও শোনা গেল, ওর পকেটে পাওয়া গেছে কিছু খুচরো টাকা আর ভাঙানি, একটা প্লাস্টিকের চিরুনি, রুমাল আর মাস্তুলির ভাঁজে একটা ফটোগ্রাফ।

নিখিল একে একে জিনিসগুলি বার করে দেখাল। মামু ফটোটো অনেকক্ষণ ধরে দেখে আমাকে দিলেন। ফটোটো একজন বছর-চল্লিশের পুরুষমানুষের। সাদা-কালো প্রিন্ট হাফ সাইজ। ফটোর লোকটার চোখে চশমা নেই, দাড়ি গোঁফ কামান। বাস্ট ফটো। উল্টো দিকে বাঙলা আঁকাবাকা হরফে লেখা ‘অবুধ পাল’। নিঃসন্দেহে মৃতব্যক্তির ফটো নয়।

আরও শোনা গেল, গুলিটা লেগেছে ওর বুকে। সম্ভবত হৃদপিণ্ড তাতে বিদীর্ণ হয়েছে। গুলি খেয়ে পড়ে যাবার পর বোধহয় মিনিট দুই-তিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছে।

ক্যামেরাম্যান এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট তাদের কাজকর্ম সেরে ইতিপূর্বেই ফিরে গেছে। মামু অ্যাম্বুলেন্সে উঠে গিয়ে মৃতদেহটি দেখে এলেন। আমিও দেখলাম। নিখিলকে বললেন, ফটোটো আপাতত আমার কাছে থাকলে কোনো অসুবিধা আছে?

—না নেই। চান তো এর একটা কপি করে আপনাকে দিতে পারি।
মামু বললেন, সেটা বরং আমিই করিয়ে নেব। বিকালের মধ্যে
অরিজিনালটা তোমাকে ফেরত দেব।

এরপর মামু অরূপ বোস-এর কাছে জানতে চান, আপনার ঘরের
ভিতরে কি ওরা ঢুকতে পেরেছিল? কিছু কি খোয়া গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ঢুকেছিল, কিন্তু কিছু নিতে পারেনি। কেউ একজন
পিছনের ভারা বেয়ে ছাদে উঠেছিল নিশ্চয়। সদর দরজা তখন বন্ধ ছিল।
মনে হয় ভারা বেয়ে ছাদে গিয়ে লোকটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে।
আমাকে গৃহবন্দি করে বাইরের ঘরে ঢোকে। আমি লাইট জ্বালামাত্র ও সদর
দরজার টাওয়ার বোল্ট খুলে পালিয়ে যায়।

নিখিল বলে, সম্ভবত ঠিক তখনই অনাথের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। আর
তৎক্ষণাৎ গুলি করে!

অরূপবাবু বলেন, অনাথ লোকটাকে তার মানে ভোজালি দিয়ে আঘাত
করেনি?

—সম্ভবত না। ভোজালিটা বোধহয় অনাথের। তাতে যে রক্তের দাগ
সেটা লেগেছে গুলি খাবার পর।

মামু আবার জানতে চান, কোনো কিছু কি খোয়া গেছে? বাইরের ঘর
থেকে?

—আজ্ঞে না। আমি এবং আমার স্ত্রী ঘরটা খুব ভালো করে খুঁজে
দেখেছি। কিছু খোয়া যায়নি।

মামু জানতে চান, বাই এনি চান্স, কাল দিনের বেলায় বাইরের ঘরে কি
রবীন্দ্রনাথের কোনো মূর্তি ছিল?

অরূপবাবু চমকে টেবিলের দিকে তাকান। বলেন, আশ্চর্য! মূর্তিটা গেল
কোথায়?

মামু মূর্তিটার বিষয়ে সবিস্তারে জেনে নিয়ে বললেন, আমরা চলে
গেলেই হয়তো সাংবাদিকেরা আসবে। প্রতিবেশীরাও নানান প্রশ্ন করবে।
আপনি কাউকে বলবেন না যে, আপনার টেবিলের উপর থেকে
রবীন্দ্রনাথের এটি মূর্তি উধাও হয়ে গেছে।

অপরূপবাবু অবাক হয়ে বলেন, কেন স্যার?

বোঝা গেল খবরের কাগজে ইতিপূর্বে মূর্তি চুরি সম্বন্ধে যা প্রকাশিত হয়েছে তা ওঁর নজরে পড়েনি। মামু বললেন, কেন বারণ করছি, তাও জানতে চাইবেন না। আপনার স্ত্রীকেও জানিয়ে দেবেন মূর্তি চুরি যাবার কথাটা গোপন রাখতে।

পিছনের দরজার কাছ থেকে প্রশ্ন হল, এটা কি তাহলে সেই আধাপাগল লোকটার কাজ? কিন্তু সে জানল কেমন করে যে, আমাদের ঘরে একটা রবীন্দ্রনাথের কাস্ট ছিল?

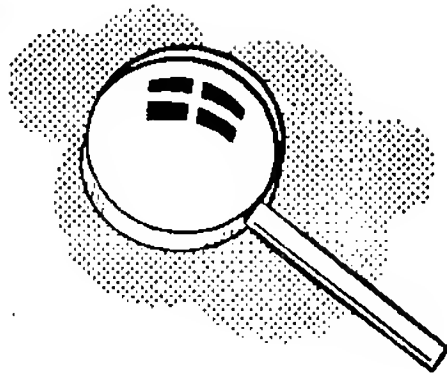
বোঝা গেল গৃহকর্ত্রী আর কৌতূহল দমন করতে পারেননি। অরূপবাবু স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, কোন আধাপাগলার কথা বলছ?

তিনি জবাব দেবার আগেই বাসুমামু উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। গৃহকর্ত্রীকে বলেন, কর্তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিও, মা। অথবা গত কয়েকদিনের পুরনো খবরের কাগজ এনে ওঁকে দেখিও। আমরা চাই না, কথাটা জানাজানি হয়ে যাক।

—কিন্তু কেন?

—সেই আধা-পাগলা লোকটা যে কাগজ পড়ে, মা। সে তো আর বদ্ধ পাগল নয়। ফলে, সে সাবধান হয়ে যাবে। তাকে ধরা আরও কঠিন হয়ে যাবে।

গৃহকর্ত্রী তাঁর কর্তার দিকে একটা চোরা-চাহনি হানলেন। ওঁরা কর্তাগিনি বোধহয় বুঝে উঠতে পারছেন না যে, এভাবে ব্যারিস্টার-সাহেব বক্রপন্থায় গৃহস্বামীকে বদ্ধ পাগলের পর্যায়ে ফেললেন কি না।



জনান্তিকে আলাপচারীর সুযোগ হওয়া মাত্র নিখিল জানতে যায়, বলুন স্যার, এখন আমাদের কী করণীয়? আমি অবশ্য এখনি জয়নগরে খবর পাঠাচ্ছি, অনাথ নস্কর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করছি। ওর বাড়ির কোনো লোককে এনে ডেডবডিটা প্রথমে শনাক্ত করতে হবে। তারপর পোস্ট-মর্টেম। সে-সব তো মামুলি কাজ। কিন্তু ওর পকেটে যে ফটো পাওয়া গেছে সেটাই কি ‘রবীন্দ্রারি’র ফটো? আপনার কী মনে হয়?

মামু বললেন, নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে হলে আমি আশ্চর্য হব না।

আমি প্রশ্ন করি, কিন্তু অনাথ নস্কর সেই আধা পাগলের ফটো পকেটে নিয়ে ঘুরবে কেন?

মামু বলেন, লোকটা ‘আধা-পাগল’ হতে যাবে কেন? হয়তো সে নিজের পরিকল্পনা মতো একটা ক্রিমিনাল-পথে কিছু করবার চেষ্টা করছে। কেন করছে, আমরা জানি না। কিন্তু সে আধা-পাগলও নয়, মনোম্যানিয়াক বা ‘ক্লিপটোম্যানিয়াক’ও নয়। অত্যন্ত ধূর্ত একটা লোক। চিন্তা করে দেখো, সে কী করে সন্ধান পাচ্ছে কোথায় কোন কলকাতাবাসীর ঘরে আছে ওই জাতের রবীন্দ্রনাথের বাস্ট।

আমি বলি, মামু, আমার প্রশ্নটা ছিল অন্য জাতির। বেশ, মেনে নিলাম, লোকটা আধা-পাগল নয়—কিন্তু অনাথ নস্কর কেন তার নাম লেখা ফটো পকেটে নিয়ে ঘুরবে?

মামু বললেন, ঠিক যে কারণে তুমি আমি এখন থেকে সেই ফটোখানা পকেটে নিয়ে ঘুরবে। অর্থাৎ মানুষজনকে জিগ্যেস করব : এই লোকটাকে চেনেন? দেখেছেন কখনও? কোথায় থাকে তা বলতে পারেন?

—তার মানে অনাথ আর সেই লোকটা একসঙ্গে এখানে আসেনি বলতে চান?

মামু বললেন, অবভিয়াসলি ও এসেছিল একই যানে—মোটর সাইকেলের পিছনে সওয়ার হয়ে।

—দ্যাটস মিলিয়ান ডলার কোশ্চেন!



বাসুমামুর এই এক দোষ! অর্ধেক কথা পেটের মধ্যে রেখে দেন। খোলাখুলি আলোচনা করতে চান না, যতক্ষণ না উনি নিজে সমাধানটা খুঁজে পান। আমি বরাবর দেখেছি এটা। সমস্ত কৃতিত্বটা একা দাবি করার একটা প্রেরণা ওঁর মজ্জাগত।

সন্ধ্যাবেলা নিখিল এল। ইতিমধ্যে জয়নগর থানা থেকে সব খবর জোগাড় হয়েছে। অনাথ নস্কর একাই থাকত। সে পেশায় ছিল রেলওয়ে ভেভার তরিতরকারি এবং বে-আইনি চালের বস্তা নিয়ে আসত শেয়ালদায়। বিয়ে-থা করেনি। তবে একটি স্ত্রীলোক ছিল তার সংসারে। বছরখানেক আগে সে অন্য একজনের সঙ্গে ভেগে পড়েছে। আর ছিল এক অবিবাহিত বোন। সেও মাস-ছয়েক আগে মারা যায়। ওদের ভাইবোনের দুজনেরই কিছু ক্রিমিনাল-রেকর্ডস আছে।

মামু জানতে চান, স্মাগলিং?

—না স্যার। একটা চুরির কেসে ভাইবোন দুজনেই মাস-তিনেক করে হাজতবাস করে যায়। চোরাই মাল উদ্ধার করা যায়নি। ওদের বিরুদ্ধে চুরির কেসও প্রমাণিত হয়নি। ফলে দুজনেই ছাড়া পেয়ে যায়। লোকাল পুলিশের ধারণা, ওরা ভাইবোন দুজনেই নির্দোষ।

—এ ধারণাটা পুলিশের হল কেন? আর চুরিটা কোথায় হয়েছিল? কী চুরি?

—চুরিটা হয়েছিল কলকাতায় হোটেল হিন্দুস্তানে। একটা অত্যন্ত দামি হিরের আংটি। দিল্লির বিজনেস-ম্যাগনেটের পুত্র সস্ত্রীক এসে উঠেছিলেন হোটেল হিন্দুস্তানে। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস জৈন। জৈনসাহেবের জবানবন্দি অনুসারে তিনি হোটেলের স্নানঘরে আংটিটা খুলে স্নান করেছিলেন। তারপর সেটা আঙুলে পরতে ভুলে যান। সস্ত্রীক তাঁরা কোথায় যেন বেরিয়ে যান। দুপুরে হঠাৎ মিস্টার জৈনের খেয়াল হয় আংটিটা হাতে নেই।

হোটেলের ফোন করে বলেন, ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘরটা খুলে আংটিটা সেফ-কাস্টেডিতে রাখতে। মজার কথা, হোটেলের বক্তব্য যে, স্নাঘরে আংটিটা ছিল না!

কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনাথ নস্কর কী ভাবে জড়িয়ে পড়ল?

—অনাথের বোন, গীতা নস্কর ছিল মিসেস জৈনের নোকরানি। দিল্লিতে অনেকদিন ছিল সে। কোনোদিন কিছু চুরি-চামারি করেনি। জৈন-দম্পতি সেই নোকরানিকে নিয়েই কলকাতায় এসেছিলেন। হোটেলের মেড-সার্ভেন্ট কোয়ার্টার্সে সে ছিল। ঘটনার দিন সকালে সে ওই ঘরে এসেছে, মেমসাহেবের ছাড়া কাপড়-জামা লব্ধিতে পাঠিয়েছে। স্নানান্তে মেমসাহেবকে প্রসাধনে সাহায্যও করেছে। তারপর কর্তা-গিন্নি হোটেলের গাড়ি নিয়ে বের হবার পর সে নিজের ঘরে ফিরে যায়। পুলিশের ধারণা হয়েছিল, সে বাথরুমে হিরের আংটিটা দেখতে পায়, এবং সরিয়ে ফেলে। তারপর তার ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে বামাল পাচার করে। হিরেটার দাম দু লাখ টাকার উপর!

আমি জানতে চাই, এটা তো হতেই পারে। তাহলে পুলিশের কেন ধারণা হল যে, ওরা ভাইবোনে মিলে চুরিটা করেনি? ওরা নির্দোষ?

—প্রথম কথা, গীতার রেকর্ডটা খুব ভালো। মিসেস জৈন তার তরফে সাক্ষী দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে কখনও সে কিছু সরায়নি। দ্বিতীয় কথা, হঠাৎ সে কীভাবে তার দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে? তৃতীয় কথা, ওরা জামিনে খালাস পাবার পর দীর্ঘ দু-বছরে ওদের জীবনযাত্রার মানটা বদলাল না কেন?

মামু জানতে চাইলেন, চুরিটা ঠিক কবে হয়েছিল? একজ্যাক্ট ডেট?

নিখিল স্বীকার করল, সেটা তার জানা নেই। এই তথ্যটা সে খোঁজ করে জানেনি। বর্তমান কেসের সঙ্গে তার প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে ওর মনে হয়নি।

মামু মাথা নাড়লেন। ঘরময় বারকতক পায়চারি করে বললেন, হোটেল হিন্দুস্তানকে ধরো তো টেলিফোনে।

এসব কাজ মামির। তিনি ডাইরেক্টরি হাতিয়ে তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন। রিসেপশানে রিঙিং টোন হতেই কর্ডলেস ফোনটা বাড়িয়ে ধরলেন মামুর দিকে।

ও-প্রান্তে সাড়া দিতেই মামু আত্মপরিচয় দিয়ে ইংরেজিতে বললেন, প্রতুলকে একটু দাও তো, মা। প্রতুল দত্ত—মানে, তোমাদের হাউস ডিটেকটিভ।

যৌগাযোগ হল। মামু জানতে চাইলেন তাঁর জিজ্ঞাস্যটা এবং তথ্যটা সংগ্রহ করে প্রতুল দত্তকে ধন্যবাদ জানালেন।

নিখিল জানতে চায়, সমাধানের পথের কোনো ইঙ্গিত পেলেন, স্যার?

মামু বললেন, কিঞ্চিৎ! একটা ক্ষীণ আলোর আভাস। কাল সরপুরিয়া খাবার পর বলতে পারব যেটা আন্দাজ করেছি সেটা ঠিক কি না।

মামিমা বলেন, সরপুরিয়া! সরপুরিয়া কোথায় পাবে?

—ন্যাচারালি কৃষ্ণনগরে! তবে চিন্তা কোরো না। এক প্যাকেট তোমাদের জন্যেও নিয়ে আসব। দিদিভাই জীবনে সরপুরিয়া খায়নি।

আমি জানতে চাই, হঠাৎ কৃষ্ণনগরে কেন?

—ওই যে বললাম, সরপুরিয়া খেতে। তুমি যদি মোয়া খেতে চাও তাহলে অনাথ নস্করের জয়নগরে যেতে পারো। আমি বাপু সরপুরিয়ার দলে।

নিখিল বলে, আপনি কি শিল্পী কার্তিক পালের সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার?

—একজ্যাক্টলি!

—তাহলে পুলিশের গাড়িতে যান না?

—পাগল? কৌশিক যদি সরপুরিয়ার সপক্ষে ভোট না দেয় তাহলে লক্ষ্মী ট্রাভল এজেন্সির ভাড়া করা গাড়ি নিয়েই যাব। পুলিশের গাড়িতে যাব কোন দুঃখে? মামলা শুরু হলে আমি তো প্রসিকিউশনের বিপক্ষে!

আমি বলি, ঠিক আছে, আমিই ড্রাইভ করে নিয়ে যাব। কোনো ট্রাভল এজেন্সির গাড়ি ভাড়া করার দরকার নেই।

—দ্যাটস ভেরি কাইন্ড অব ইউ।

জিগ্যেস করি, রিভলভারটা কি সঙ্গে নিতে হবে?

মামু বললেন, কী দরকার? ওটা আলমারিতেই বন্ধ থাক না। পথেঘাটে ডাকাত বা অ্যান্টিসোসালের পাল্লায় পড়লে তাকে বরং একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে দিও : তুই জানিস না রাস্কেল? আমার শোবার ঘরে আলমারিতে

একটা লোভেড রিভালভার থাকে? এখনি নিয়ে এসে দেগে দেব : দুম পটাস!

মিঠু—আমার তিন বছরের মেয়ে—খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে : দুম পটাস!

*

*

*

*

কার্তিক পাল কৃষ্ণনগরের একজন স্বনামধন্য শিল্পী। শহরের উপকণ্ঠে ঘূর্ণিতে তাঁর আস্তানাটা খুঁজে নিতে আমাদের কোনো বেগ পেতে হল না। তে-মাথার মোড়ে তাঁর দোকান-কাম-স্টুডিও-কাম ভদ্রাসন। গাড়ি থেকে নামতেই একটি বছর কুড়ি বাইশের ছেলে এগিয়ে এসে বললে, আসুন স্যার, এইদিকে—

মামু বললেন, হ্যাঁ, দোকান তো দেখবই; কিছু কিনেও নিয়ে যাব, কিন্তু আমরা এসেছি শিল্পী কার্তিক পালের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি কি আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন। দোতলায়। কী বলব তাঁকে? কে এসেছেন?

ওয়ালেট খুলে মামু নিক্ককথায় একটা ভিজিটিং কার্ড ধরিয়ে দিলেন। একটু পরেই নেমে এলেন শিল্পী স্বয়ং। পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়া পায়ে বিদ্যাসাগরী তালপাতার চটি। বয়স প্রায় মামুর সমান। আশির এপাশ-ওপাশ। দীর্ঘদেহী নন, কিন্তু সৌম্যদর্শন। যুক্ত করে নমস্কার করে বললেন, কী সৌভাগ্য আমার। আসুন ব্যারিস্টার-সাহেব। আপনার কীর্তি কাহিনির কথা কাঁটা-সিরিজের কল্যাণে আমার অজানা নয়। আসুন, আমরা এ ঘরে এসে বসি।

একতলার বৈঠকখানায় আমরা তিনজনে বসলাম। উনি জানতে চাইলেন, কলকাতা থেকে সোজা গাড়িতে আসছেন মনে হচ্ছে। কৃষ্ণনগরে উঠেছেন কোথায়?

মামু বললেন, কোথাও উঠব না। অত্যন্ত জরুরি কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি আপনার কাছে। সংবাদ সংগ্রহ হয়ে গেলে আবার সরাসরি কলকাতায় ফিরে যাব। আজ রাত্রেই।

উনি বললেন, আপনি ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। আমাদের পাখলাচণ্ডীর শঙ্করদার মতো। যারা শঙ্করদাস ব্যানার্জির কথা বলছি। তা আমার মতো মাটির মানুষ কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করবে?

আমি ব্যঙ্গ করে বলি আপনি বুঝি ‘মাটির মানুষ’?



বিস্তারিত কথা হল।

মামু উঠে গিয়ে ওঁর টেবিল থেকে একটি বিশেষ রবীন্দ্রমূর্তি নিয়ে এসে বললেন, এমন মূর্তি আপনার দোকানে কতগুলি আছে?

—সঠিক জবাব দিতে হলে খাতাপত্র ঘাঁটতে হবে। তবে হলফ নিয়ে কাঠগড়ায় যখন উঠে দাঁড়াইনি তখন আন্দাজে বলতে পারি—বিশ-পঞ্চাশটা।

—এই মাপের, এই মডেলের মূর্তি এ পর্যন্ত আন্দাজ কত বেচেছেন? মাটির মূর্তি নয়, প্লাস্টার-অব্-প্যারিসের?

—তা হাজারের উপর। শুধুমাত্র উনিশশো একষট্টিতে—মানে শুধু রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষেই পাঁচশোর উপর! কেন বলুন তো?

মামু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আবার প্রশ্ন করেন, কী দামে সেগুলি বিক্রি হয়?

কার্তিক পাল বলেন, আমি ঠিক জানি না। এরা বলতে পারে। শব্দু?

সেই ছেলেটি এগিয়ে এল। শিল্পীর প্রশ্নের জবাবে বললে ত্রিশ টাকা করে। মামু বলেন, কিন্তু নিউমার্কেটে তো এটার দাম পঁয়তাল্লিশ?

কার্তিক বলেন, তা তো হবেই। নিউকাসল আর লন্ডনে কি কয়লার এক দর? দেখুন না, আপনার ‘কাঁটা-সিরিজের’ একশো টাকা দামের বই বইমেলা প্রাপ্তগে বিক্রি হয় নব্বই টাকায়। দেজ পাবলিশিং-এর কাউন্টারে আশি টাকায়, আবার দেজ পাবলিশিং রিটেলারকে বেচে সত্তর টাকায়। কী মিস্টার মিত্র, ঠিক বলিনি?

আমাকে জবাব দিতে হল না। তার আগেই মামু বললেন, শব্দু, তুমি বাবা একটা বুড়িতে হাফ-আ-ডজন ওই মাপের মূর্তি আমাকে প্যাক করে দাও তো। মাটির নয়, প্লাস্টার-অব্-প্যারিসের। এই নাও একশো আশি টাকা।

শব্দ বললে, দিচ্ছি। কিন্তু ছয়টা একসঙ্গে নিলে পাইকারি দাম পড়বে, পাঁচিশ টাকা করে। আপনি দেড়শো টাকা দেবেন আমাকে।

শব্দ ঘর ছেড়ে নিষ্কান্ত হলে মামু পকেট থেকে সেই ফটোখানা বার করে কার্তিকবাবুকে দেখালেন। জানতে চাইলেন, এই ফটোখানা দেখুন তো। এই লোকটাকে কি চিন্তে পারেন?

শিল্পী চশমাটা বদলালেন। তাঁর চশমা বাইফোকাল নয়। ফতুয়ার পকেট থেকে রিডিং গ্লাস বার করে নাকে চড়ালেন। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, আজে হ্যাঁ, বদমায়েশটাকে চিনি। আমার এখানে মূর্তি গড়ার কাজ শিখত, বছর তিন-চার আগে। তারপর কী একটা অপরাধে ওকে পুলিশে ধরে আমারই এই স্টুডিও থেকে। বিচারে ওর সাজা হয়ে যায়। সশ্রম কারাদণ্ড। তাও প্রায় বছর দুই আগে। এর ফটো কোথায় পেলেন?

মামু সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, কী নাম লোকটার?

—অবোধ পাল।

—‘অবোধ’ না ‘অবুধ’?

—না, ‘অবুধ’ নয়। ‘অবোধ’।

—লোকটা কি বিহারি অথবা উত্তরপ্রদেশের?

—না তো। খাঁটি বাঙালি। বাড়ি কলকাতায়। ওর বাপের একটা কারখানা আছে, পটুয়াটোলায়। কলকাতা শহরে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রতিমা বানানো হয়। বাপের কাছেই কাজ শিখেছিল : মৃৎশিল্প। আমার কাছে ব্রোঞ্জ আর প্লাস্টার অব্ প্যারিসের প্রযুক্তি শিখতে আসে। প্রায় বছরখানেক ছিল। বেশ শিখছিলও। —তারপর ওর কী যে দুর্ঘটিত হল! তা অবোধকে বিহারি বলে কেন মনে হল আপনার?

মামু বললেন, ‘বুধ’ মানে পণ্ডিত, জ্ঞানী। ফলে ‘অবুধ’ মানে মূর্খ। তেমনি ‘অবোধ’ মানেও নির্বোধ। এমন নাম কে রাখবে ছেলের?

কার্তিক বললেন, তা হিন্দিতে কি ‘অবোধ’ মানে পণ্ডিত?

—না, হিন্দিতে এর উচ্চারণ ‘অয়োধ’, মানে অযোধ্যাবিহারীর সংক্ষিপ্ত রূপ। কৃষ্ণের ডাকনাম যেমন বাংলায় ‘কানু’, জগন্নাথের ‘জগু’। তাই ভাবছিলাম ওর নামটা ‘আউধবিহারী’ বা ‘অযোধ্যাবিহারী’ নয় তো?

আমি বলি, ‘পাল’ কিন্তু একটা খাঁটি বাঙালি পদবি।

মামু সেকথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, অবোধের বিরুদ্ধে চার্জটা কী ছিল? কতদিনের সাজা হয়?

—শুনেছি কার সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করতে করতে ছুরি मेरे বসে। লোকটা মারা যায়নি। কিন্তু মারাত্মকভাবে জখম হয়। মাস-দুয়েক হাসপাতালে ছিল। রাহাজানির কেসে দেড়-দু বছরের জন্য মেয়াদ হয়ে যায়। এখানকার থানায় বিস্তারিত জানতে পারবেন।

—সে কি সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছে?

—তা তো জানি না!

হঠাৎ নেপথ্য থেকে যেন দৈববাণী হল, আঙ্রে হ্যাঁ, অবোদা ছাড়া পেয়ে গেছে। দিন পনেরো আগে একবার ঘূর্ণিতে এসেছিল। আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখাও করে।

আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি শব্দু আবার এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে।

পালমশাই সোজা হয়ে উঠে বসেন। বলেন, আরে। তুই তো আচ্ছা ছেলে। আমাকে তো কিছু বলিসনি?

—অবোদা যে বারণ করেছিল। বলেছিল, বড়বাবু শুনলে চটে যাবেন। রগচটা মানুষ তো?

—আমি রগচটা মানুষ?

—না, মানে আমি তো ও কথা বলিনি। বলেছিল অবোদা।

—অবোধ তোর কাছে কেন এসেছিল?

শব্দু মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে।

—কী হল? জবাব দিচ্ছিস না কেন?

শব্দু অস্ফুটে বললে, বিক্রির খাতাপত্র এক নজর দেখতে—

—তুই তো আচ্ছা ছেলে! আমাকে না জানিয়ে তুই তাকে খাতাটা দেখতে দিলি?

—আমি ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম দাদু, ওকে খাতাখান ছুঁতে পর্যন্ত দিইনি। নিজেই পাতা উল্টে ও যা দেখতে চায় তা দেখিয়ে দিইচি!

—বেশ করেছ। তা তাকে কী দক্ষিণা দিল অবোধ?

শব্দু জবাব দেয় না। ঘাড় চুলকায়।

—কী রে? সরপুরিয়া খেতে কিছু নগদ দিয়ে যায়নি? কত?

—আঙ্রে পঞ্চাশ টাকা।

—পঞ্চাশটাকা সরপুরিয়া তুই একা খেলি? আমাকে ভাগ দিলি না? ঠিক আছে। এবার থেকে আমাকে না জানিয়ে কাউকে খাতাপত্র দেখাবি না। বুঝেছিস?

—আজ্ঞে না।

—আজ্ঞে, না?

—মানে, হ্যাঁ বুঝেছি। দেখাব না।

—এবার যা তুই। এ ঘরে আড়ি পাতিস না আর। যা পালা।

মামু বললেন, আপনি তাহলে ওকে অনুমতি দিয়ে যান পাল-মশাই। আমি কিছু খাতাপত্র খুঁটিয়ে দেখব।

—কোন খাতা?

—আপনার বিক্রির ভাউচার, অ্যাটেভেন্স রেজিস্টার, মাহিনা দেবার রেজিস্টার, ভিজিটার্স বুক—সব কিছু।

—তা দেখুন বসে। ঘর ভর্তি শিল্পকর্ম। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি আশি বছর ধরে তৈরি করেছি। সেদিকে আপনার নজর নেই—নজর শুধু খাতাপত্রের দিকে। তা দেখুন। আমাকে তাহলে বিদায় দিন—

আমি অভিমানী শিল্পীকে তৎক্ষণাৎ বলে উঠি, মিস্টার পাল। মামু হিসেব-নিকেশ ঘাঁটুন, আমি কিন্তু আপনার স্টুডিওটা ঘুরে দেখতে চাই।

—আসুন তবে।

আমি ওঁর সঙ্গে সংলগ্ন স্টুডিও ঘরে নানান মূর্তি দেখতে গেলাম। উনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। নানান ফটোগ্রাফও আছে। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী শিল্পীকে পুরস্কৃত করছেন বা তাঁর শিল্পকর্ম দেখছেন, ইত্যাদি প্রভৃতি।

মামুর সঙ্গে শম্ভুর কী জাতীয় কথোপকথন হয়েছিল সে-কথা পরে শুনেছি, মামুর কাছে।

বাসু-মামু ওর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তোমার অবোদা বিক্রি খাতার ঠিক কোন্ কোন্ পাতা দেখতে চেয়েছিল তা তোমার মনে আছে?

—আজ্ঞে না। তা কি কারও মনে থাকে? তবে চেষ্টা করলে খুঁজে বার করতে পারব।

—কী ভাবে? কোন্ সূত্রে?

—অবোদা বলেছিল যেদিন এই স্টুডিওর ভিতর তাকে পুলিশে ধরে ঠিক তার আগের দিন পর্যন্ত সব বকেয়া মাইনে সে পেয়েছে কি না তাই

দেখতে এসেছে। তা, আমি তাকে হাজিরার খাতাটা দেখাই, পে-রেজিস্টারটাও। ও মিলিয়ে দেখে নেয় যে, হপ্তাবারের শেষ পাই-পয়সা ওকে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—সে হোলসেল বিক্রির খাতা বা ভিজিটার্স বুক দেখতে চায়নি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও দেখতে চেয়েছিল। দেখেছিল। কিছু কিছু নাম-ঠিকানা টুকেও নিয়ে গিয়েছিল। মানে কাকে কোন মূর্তি বেচা হয়েছে।

—কেন? সে ঠিকমতো মজুরি পেয়েছে কি না এটা জানার জন্য ওসব খাতা দেখার তো কোনো দরকার ছিল না। ছিল?

—আজ্ঞে না। তা ছিল না।

—তাহলে সেসব খাতাপত্র সে কেন দেখতে চাইছে, তা তুমি জানতে চাওনি?

শম্ভু একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, আজ্ঞে না।

—কেন?

শম্ভু নিরুত্তর।

—তার আগেই বোধহয় তোমার অবোদা সেই পঞ্চাশটাকার নোটখানা তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। তাই না শম্ভু?

শম্ভু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ মামুর চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, আমি কি অন্যায় করেছি কিছু?

মামু বললেন, তা কিছুটা অন্যায় করেছ বইকি, শম্ভু। অবোদা তোমার যতই প্রিয় হোন, মালিককে না জানিয়ে খাতাপত্র তাকে দেখানো ঠিক হয়নি।

—কিন্তু এরমধ্যে লুকোছাপা তো কিছু নেই। তাছাড়া খাতা তো তার হাতেও দিইনি। আমিই খাতার পাতা উল্টিয়ে তাকে দেখিয়েছিলাম।

—ঠিক আছে শম্ভু। ও আলোচনা থাক। এবার বলো তো কতদিন আগে সে এসে তোমার কাছে খাতাপত্র সব দেখে যায়।

—গেল হপ্তার গোড়ার দিকে। তারিখটা ঠিক আমার মনে নেই, স্যার!

—তাকে কতদিন আগে পুলিশে ধরে তা তোমার মনে আছে?

—তারিখ মনে নেই। তবে এটা মনে আছে সেদিনটা ছিল শিবরাত্রি।

—প্রায় আড়াই বছর আগে? সাতানব্বই সালে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—তাহলে তারিখটা ছিল পঁচিশে ফেব্রুয়ারি। এবার তুমি খাতাপত্র দেখে আমাকে বলো তো সেই সময়, মানে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে তোমাদের স্টুডিওতে এই রকম রবীন্দ্রনাথের মূর্তি—ঠিক এই মাপের, মাটির নয়, প্লাস্টার অব-প্যারিসের মূর্তি—কতগুলো ছিল?

শম্ভু খুব করিৎকর্মা ছেলে। খাতাপত্র দেখে বললে, ছয়টা স্যার।

—সেগুলো কে বানিয়েছিল?

—মানে প্লাস্টার-কাস্ট করেছিল?

—হ্যাঁ।

—ওই অবোদাই।

—কত তারিখে?

—খাতায় তা লেখা নেই। তবে দু একদিন আগেই হবে। কারণ দিন সাতেক হাওয়ায় শুকিয়ে গেলে প্লাস্টার-অব-প্যারিসের মূর্তিগুলো আর খোলা জায়গায় রাখা হয় না। ধুলোয় নষ্ট হয়ে যায়। কেষ্টনগরী ধুলো তো? সে ধুলো এখানকার মশা, মাছি, মাটির পুতুল আর সরপুরিয়ার মতো বিখ্যাত।

মামু হেসে ফেলেন। বলেন, তাই বুঝি? তখন সে মূর্তিগুলো সব কোথায় যায়?

কাঁচের আলমারিতে। অথবা খড়ের প্যাকিং দেওয়া কাঠের বাক্সে। ধুলো এড়াতে।

—ঠিক আছে। এবার তুমি তোমাদের ভিজিটার্স বুকটা নিয়ে এসো তো। সেই পঁচিশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে দেখব।

খাতা দেখতে দেখতে নজরে পড়ল একটা নাম। অরূপ বসু। তার সল্টলেকের ঠিকানাও লেখা আছে। মার্চ মাসের বাইশ তারিখে। মামু জানতে চাইলেন, এই ভদ্রলোক তোমাদের দোকানে এসেছিলেন দেখছি। তিনি কী কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন বলো তো?

শম্ভু বলে, তা কি বলা সম্ভব? উনি এসেছিলেন। খাতায় লিখেও গেছেন দেখছি। কিন্তু কিছু কিনেছিলেন কি না তা তো জানি না। জানা সম্ভবও নয়।

মামু বললেন, তা তো বটে। দেড় দুবছর আগে কে কোন মূর্তি বা পুতুল কিনে নিয়ে গিয়েছিল তা তোমার মনে থাকার কথাও নয়। কিন্তু তুমি আর একটা কাজ করতে পার। বিক্রির ভাউচারগুলো মিলিয়ে দেখো তো— ওই

বাইশে মার্চ, আটানব্বই সালে তোমাদের দোকান থেকে রবীন্দ্রনাথের কোনো প্লাস্টার-অব -প্যারিসের মূর্তি বিক্রি হয়েছিল কি না? ত্রিশ টাকায়? ক্রেতা যেই হোন।

ধূলিধূসরিত ভাউচারের বাডিল ঘেঁটে শেষকালে শব্দ জানাল, আশ্চর্য ধরেছেন তো, স্যার। এই দেখুন ২২.৩.৯৮ তারিখের বিক্রির কাউন্টার ফয়েলে একটা ত্রিশ টাকা দামের মূর্তি বিক্রির কথা লেখা আছে। আপনি কী করে জানলেন?

মামু বলেন, বলছি। তার আগে বলো—তোমার অবোদা কি এই পুরনো ভাউচারগুলো ঘেঁটেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকক্ষণ ধরে সে এসব কাগজপত্র ঘেঁটেছিল। কিন্তু কোনো কাগজ সরিয়ে নেয়নি, বা ট্যাম্পার করেনি। কারণ আমি খাড়া পাহারা দিচ্ছিলাম।

মামু মানিব্যাগ খুলে একটা একশো টাকার নোট শব্দুর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, এটা তোমাকে সরপুরিয়া খেতে দিচ্ছি। না, ঘুষ নয়, তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, তার জন্য পারিশ্রমিক। তোমার দাদু—মানে ওই পালমশাইকে আমি জানিয়ে যাব যে, এটা আমি খুশিমনে তোমাকে মিষ্টি খেতে দিয়েছি।

কোথাও কিছু নেই শব্দু নত হয়ে ওঁকে প্রণাম করল।

বাসুমামু বললেন, শোনো শব্দু। তুমি যে তখন বললে না যে, অবোধ পালকে যখন পুলিশে ধরে তখন স্টুডিওতে ছয়টা প্লাস্টার অব প্যারিসের মূর্তি ছিল, তার চারটে মূর্তির হদিশ আমি পেয়েছি। এখন আমি যদি জানতে পারি, বাকি দুটো মূর্তি কে কিনেছেন তাহলেই আমার এখানকার কাজ শেষ হবে। সেটা কী ভাবে জানা যায়?

—তা কী করে জানা যাবে? সে তো এক্ষেত্রে অসম্ভব!

—কেন? একেবারে অসম্ভব হবে কেন? প্রথম কথা, মূর্তিদুটো বিক্রি হয়েছে ১৯৯৮-এর পর। ধৈর্য ধরে যদি দু বছরের ভাউচার ঘাঁটা যায় তাহলে দেখা যাবে ত্রিশ বা ত্রিশ দুগুণে ষাট টাকার ভাউচার কটা আছে। দুটো মূর্তি তো আর কেউ আমার মতো পাইকারি দরে কিনতে পারবে না?

—না, তা পারবে না। কিন্তু সারাদিন ধরে ঘেঁটে ঘেঁটে এমন ভাউচার তো বিশ-পঞ্চাশটা পাব। পাব না?

ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। তাঁর নাকি ক্যাসেটও আছে। তাঁর বন্ধুও সাহিত্য-সাহিত্য করেন। দুজনেই তাই রবীন্দ্রভক্ত। তাই দাদু ওঁদের দুজনকে—

—শিল্পী কার্তিক পাল কি সম্পর্কে তোমার দাদু হন?

—আজ্ঞে না। সম্পর্ক কিছু নেই। ওঁর অনেক বয়েস হয়েছে তো, তাই আমরা—এখানকার কর্মীরা ওঁকে ‘দাদু’ বলে ডাকি।

—তা ভিজিটার্স বুক দেখে নাম দুটো খুঁজে পাবে?

—পাব, স্যার। কারণ দু-জনের কারও নাম মনে না থাকলেও এটা মনে আছে যে, ডাক্তারবাবুর বন্ধুটির বাড়ি ‘নোনাচন্দনপুর’।

—‘নোনাচন্দনপুর’, না ‘নোনাচন্দনপুকুর’?

—না স্যার, পুকুর যদি ‘চন্দনের’ হয়, তাহলে ‘নোনা’ হবে কী করে? আবার কী-বলে-ভালো, পুকুরের জল যদি নোনা হয়, তবে তা ‘চন্দন’-এর নয়—সমুদ্রের খাঁড়ির সঙ্গে তার আঁতাত আছে।

মামু বললেন, এটা তুমি পণ্ডিতের মতো একটা যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছ, শম্ভু। আ পন্ড ক্যান আইদার বি সলিট অর অব স্যান্ডেল-উড ক্রিম। ইট কান্ট বি বোথ। ঠিক আছে, এসো, ভিজিটার্স বইটা হাতড়াতে থাকি।

খুব বেশি খুঁজতে হল না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই পরপর দুজন ভিজিটার্স বইতে মন্তব্য লিখেছেন। নাম ও ঠিকানা দিয়েছেন :

১. ডাক্তার অসিত দত্ত, এম বি, বি. এস, শ্রীরামপুর।

২. শ্রীদেবেন বিশ্বাস, নোনাচন্দনপুকুর।

দুজনেরই টেলিফোন নাম্বার আছে।

বাসু বললেন, এই দেখো শম্ভু। ওঁর ঠিকানাটা ‘নোনাচন্দনপুর’ নয়, ‘নোনাচন্দনপুকুর’।

শম্ভু স্বচক্ষে খাতাটা দেখে নিয়ে বললে, ওটা দেবেনবাবু তাড়াহুড়ায় ভুল লিখেছেন। ‘চন্দনপুকুর’ কখনো ‘নোনা’ হতে পারে না।

মামু বললেন, হয়তো তোমার যুক্তিই ঠিক। তাছাড়া ভদ্রলোক সাহিত্য টাহিত্য করেন যখন, তখন নিজের বাড়ির ঠিকানায় বানান ভুল তো হতেই পারে—এস্তাই তো হোন্দাই রহতা।

মধ্যাহ্ন-আহ্নারান্তে আমরা বেলা সাড়ে-তিনটে নাগাদ রওনা হলাম ঘূর্ণি থেকে। কৃষ্ণনগরে পৌঁছেই মামু বলেন, দুটো কাজ এখানে করতে হবে। এক নম্বর, দুই কে. জি. সরপুরিয়া কেনা। দু-নম্বর, কলকাতায় একটা এস. টি. ডি.।

আমি বলি, সরপুরিয়াটা চলুন গিরীন্দ্রের দোকান থেকে কিনি—

—তুমি দেখছি, এ-পাড়ার কোন দোকানে কী ভালো পাওয়া যায় সে খবরও রাখো।

—তা রাখি মামু। গোয়াড়ী-কেষ্টনগর আমার অচেনা জায়গা নয়। কিন্তু এস. টি. ডি. করবেন কাকে? বাড়িতে?

—না। নোনাচন্দনপুকুরে।

—‘পুকুর’ না ‘পুর’?

—আবার সেই পুরনো-কাসুন্দি!

সরপুরিয়া কেনা হল। তারপর শহরের একটি এস. টি. ডি. বুথ থেকে মামু কোন-এক দেবেন বিশ্বাসকে ফোন করলেন। তখনো আমি জানি না শস্তুর মারফতে মামু কী কী সূত্র আবিষ্কার করেছেন। দেবেন বিশ্বাসকে আমি চিনতে পারলাম না। তিনি কিন্তু বাসু-মামুকে সহজেই চিনতে পারলেন। তাঁর অনুরোধ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, কেন স্যার? এমন অদ্ভুত আদেশ করছেন কেন? আপনার প্রয়োজন থাকে তাহলে সন্ধ্যা সাতটার সময় আমি নিজেই তো আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে পারি।

বাসু বললেন, না। আমার বাড়িতে নয়। ওই যা বললাম—দমদম স্টেশনের ফাস্ট-ক্লাস ওয়েটিং রুমে। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা। প্রয়োজনে দমদম-শেয়ালদা একখানা ফাস্ট-ক্লাস-টিকিট কেটে নিয়ে ওয়েটিং-রুমে ঢুকে বসে থাকবেন। অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার। আপনারই স্বার্থে। আমি বর্তমানে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে আছি। ঘন্টা তিনেকের মধ্যে দমদমে পৌঁছে যাব।

—আচ্ছা স্যার। তাই যাব। দমদম স্টেশনে ফাস্ট-ক্লাস ওয়েটিং রুমে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা বসে অপেক্ষা করব।

—আর একটা কথা। আপনার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের একটা মূর্তি আছে, না? সাত-আট ইঞ্চি খাড়াই? বাস্ট? প্লাস্টার অব্ প্যারিসের?...কী হল? আপনি লাইনে আছেন তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আছি। কিন্তু মানে, আপনি তো আমার বাড়িতে কখনো আসেননি। আমার বাড়িতে গুরুদেবের...

—মূর্তিটা আছে, না ইতিমধ্যে হাফিজ হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে না, আছে। ওই তো আমার চোখের সামনেই রয়েছে। টেবিলে।

—তাহলে ওটাকে এন্ফুনি তুলে স্টিল আলমারির ভিতর বন্ধ করে চাবিটা গিল্লিকে দিন। গিল্লিমা বাড়িতেই আছেন তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন।

—তাকে বলবেন, চাবিটা সাবধানে রাখতে। মূর্তিটা বেহাত না হয়ে যায়।

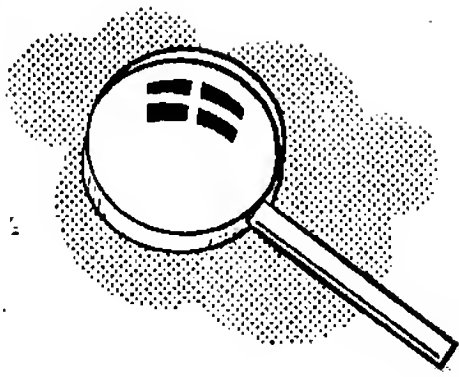
—তুলসী—?

—তুলসী? তুলসী মানে?

—ও, আয়াম সরি, স্যার। মাউথপিসে হাতটা চাপা দিতে ভুলে গেছি। এটা...মানে, আমি আমার গিল্লিকে ডাকছি... আপনি আমাকে এমন ঘাবড়ে দিয়েছেন...

—ঘাবড়াবার কী আছে? নাথিং টু ও'রি অ্যাবাউট। মূর্তিটা সেফ কাস্টডিতে রেখে সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেড়াতে দমদম স্টেশনে চলে আসবেন। এতে ঘাবড়াবার তো কিছু নেই।

—আজ্ঞে না, তা নেই।



পৌনে সাতটা নাগাদ আমরা এসে পৌছলাম দমদম স্টেশনে। গাড়িতে আসতে আসতে মামু আমাকে তাঁর সংগৃহীত তথ্যগুলি সবিস্তারে জানানেন। অর্থাৎ শম্ভুর সঙ্গে তাঁর কী জাতীয় কথাবার্তা হয়েছিল, কীভাবে তিনি ওই দুই বন্ধু—দেবেন বিশ্বাস আর অসিত দত্তের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন এবং জানতে পেরেছেন ‘ষড়ানন’ রবীন্দ্রমূর্তির নক-আউট টুর্নামেন্টে সেমিফাইনাল থেকে ফাইনালে উঠেছে কোন দুটি মূর্তি। ‘রবীন্দ্রারি’ বর্তমানে ওই দুটি মূর্তি ভাঙবার জন্য কালাপাহাড়ের ভূমিকায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন বেড়াচ্ছে—তা অবশ্য আমি জানি না।

দমদম স্টেশনের সামনে গাড়ি পার্ক করার পর মামু বললেন, আমি আর নামব না। তুমি যাও, ফাস্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে বসে আছে দেবেন বিশ্বাস। তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

তাঁর হুকুম তামিল করতে আমি একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে স্টেশনে ঢুকলাম। কিন্তু ফাস্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে মস্ত তালা খুলছে। এদিক-ওদিক তাকাছি একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, মিস্টার কৌশিক মিত্র? দেবেন বিশ্বাসকে খুঁজছেন?

আমি বলি, তা খুঁজছি, কিন্তু স্টেশনে নয়। ফাস্টক্লাস ওয়েটিং রুমের ভিতরে।

উনি বলেন, বেহুদো টিকিট কাটব কেন? আমি তো ওয়েটিং রুমের দোরগোড়াতেই বসে আছি। ওখানে ঢুকবার তো একটাই দরজা।

আমি বলি, আপনি তো দেখছি সেই কাবুলিওয়ালার মতো হিসেবি। অধমর্ণকে খুঁজে না পেয়ে সে কবরস্থানের একমাত্র প্রবেশদ্বারের সামনে অপেক্ষা করছিল : বেটা যাবে কোথায়? একদিন না একদিন এখানে তো তাকে আসতেই হবে।

হো হো করে হেসে ওঠেন দেবেনবাবু। বলেন, আপনার মামু কোথায়?

—বাইরে। গাড়িতে।

—তবে চলুন যাই।

—আপনি স্টেশনে এসেছিলেন কি সাইকেল রিকশায়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাসুমামুর সাক্ষাৎ পেয়েই দেবেনবাবু তাঁর পদধূলি নিলেন। বলেন, কী ব্যাপার স্যার? আপনি কী করে...

—মাঝ-সড়কে নয়, দেবেন। চলো তোমার বাড়িতে যাই আগে। বৈকালিক চা পানটাও যে বাকি আছে। তুলসীর হাতে এককাপ চা খাওয়া যাবে।

—তুলসী?

—সে কি গো? তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে? তোমার 'গৃহমুচ্যতে'র নাম 'তুলসী' নয়?

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তখন টেলিফোনের মাউথপিসটায় হাত-চাপা না দিয়েই... দেবেনবাবুর নির্দেশমতো বাঁক নিতে নিতে ওঁর বাড়ির দিকে চলতে থাকি। মামু-বলেন, তোমার বাড়িটা তো নোনাচন্দনপুকুরে?

—আজ্ঞে না তো।

—যা বাব্বা! তবে কি নোনাচন্দনপুরে?

—আজ্ঞে না। পূর্ব কালিয়াচকে। তবে সেটা নোনাচন্দনপুকুরের প্রায় লাগায়ো।

বাড়িতে পৌঁছেই উনি হাঁকডাক শুরু করলেন। এগিয়ে এলেন দেবেনবাবুর সহধর্মিণী এবং কন্যা পাপিয়া। মামু সদর অতিক্রম করেই বললেন, একটু দাঁড়াও। তিনি সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার কৌশলটা লক্ষ করে দেখলেন। কোলাপসিবল্ গেট আছে। সরেজমিনে তদন্ত সেরে বাসু-মামু গিয়ে বসলেন বাইরের ঘরে। দেবেনবাবুর কন্যা পাপিয়া এসে প্রণাম করল। তাঁর নাতনিও। কিন্তু ওঁর স্ত্রী প্রণাম করার উদ্যোগ করতেই মামু বললেন, থাক মা। তোমায় প্রণাম করতে হবে না।

তুলসী ঘাবড়ে যান। বলেন, কেন? আপনি সকলের প্রণাম নিলেন, আমিই বা বাদ যাব কেন?

—তোমার পায়ে যে বাত, মা। নিচু হতে গেলে তোমার কষ্ট হবে না?

—বাত! আপনি কেমন করে জানলেন?

—বাঃ! সদর দরজা থেকে বৈঠকখানা, এতটা পথ একসঙ্গে হেঁটে এলাম—এটুকু টের পাব না?

তুলসী শুনলেন না। জোর করে প্রণাম করলেন। মামু পাপিয়াকে বললেন, চায়র জল বসিয়ে দাও, দিদি! কিন্তু স্রেফ চা। মধ্যাহ্নে বিদুর খুদে গুরুভোজন হয়েছে।

তারপর দেবেনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, আলমারি থেকে মূর্তিটা বার করে নিয়ে এসো দিকিন।

আমাকেও বললেন ঝুড়ি থেকে একটা রবীন্দ্রমূর্তি সাবধানে বার করতে। দেবেনবাবু আলমারি খুলে তাঁর মূর্তিটা নিয়ে আসতেই বাসুমামু সেটাকে পরীক্ষা করে দেখলেন। বললেন, এটা আমি নিয়ে যাব?

—নির্ন।

—পরিবর্তে কিছু না দিয়ে নিচ্ছি না তা বলে। এটা তোমাকে বদলে দিচ্ছি—

দেবেনবাবু নিক্কথায় হাত বাড়িয়ে বললেন, দিন।

—মামু অবাক হলেন। বলেন, তুমি তো মাটির মানুষ হে! একবার জানতেও চাইলে না, কেন এই দেওয়া-নেওয়া।

দেবেন বললেন, আমার পদবী ‘বিশ্বাস’। কুলধর্ম অনুসারে আমরা বিশ্বাস করি : ‘বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর!’ তাছাড়া কেন যে এই দেওয়া-নেওয়া তা তো কৌশিকবাবুর কাঁটা-সিরিজের বইটা বার হলেই জানতে পারব। আগে থেকেই হাঁকপাঁক করে কী লাভ? গল্পটার বিন্দুবিসর্গও তো জানি না এখনো।

মামু বলেন, খুব ভালো কথা। হি অল্‌সো সার্ভ হ ওনলি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েইট! শোনো দেবেন, নাইন্টি ফাইভ পার্সেন্ট চান্স: আজ-কাল-পরশুর মধ্যে কোনো এক রাতে তোমার বাড়িতে চোর আসবে। গভীর রাতে। তাই আমি আগেভাগে তোমাদের সাবধান করতে এসেছি। আজও চুরির চেষ্টা হতে পারে। তোমার বাড়িতে কুকুর নিশ্চয় নেই। থাকলে সাড়া পেতাম এতক্ষণে।

—আজ্ঞে না, নেই।

—তোমরা দোতলাতে শোও নিশ্চয়। তা রাতে বৈঠকখানায় কেউ শোয় কি?

—আজ্ঞে না।

—দ্যাটস ভেরি গুড। আমি যে মূর্তিটা দিলাম ওটা টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখবে। আর আজ রাতে কোলাপসিবল্ গেটে তালা লাগাতে ভুলে যাবে—

—ভুলে যাব? রাতে গেটে তালা দিতে?

—হ্যাঁ, যাবে। মানুষে মাঝে মাঝে এমন ভুল কি করে না? ওয়ালস ইন আ বু-মুন? তাছাড়া দরজায়, হুড়কোও লাগাতে ভুলে যাবে। টাওয়ার বোল্টটা ওপরের দিকে তুলে দিও—কিন্তু বাঁকিয়ে দিও না। যাতে বাইরে থেকে কেউ আস্তে আস্তে নাড়ালে ছিটকিনিটা নিচে পড়ে যায়। চোরের যেন ভিতরে ঢুকতে কোনো অসুবিধা না হয়।

দেবেনবাবু শেষ কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন : ‘ভিতরে ঢুকতে যেন কোনো অসুবিধা না হয়।’ ওমা কেন?

—অ্যাঁই দ্যাখো! তুমি পদবিবিরুদ্ধ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসেছ। তোমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে নিখাদ নয়!

দেবেন কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না।

মামু বললেন, তোমরা সজাগ থেকো। তাছাড়া চোর দোতলায় উঠবে না। একতলায় তোমার টিভি বা ভিসিপি-তেও হাত দেবে না। সে শুধু এই রবীন্দ্রমূর্তিটা উঠিয়ে নিয়ে চম্পট দেবে। যাক্। খুটখাট্ শব্দ পেলেও তোমরা নিচে নেমে এসো না। ভয় নেই। তোমাদের বাড়িতে আর্মড গার্ড পাহারা দেবে। সে ব্যবস্থা করছি এখনই। তুমি এই নম্বরে একটা ফোন করো তো? এটা নিখিল দাসের ডাইরেক্ট নাম্বার। লালবাজারে। ও বোধহয় এখনো লালবাজারেই আছে। দেখা যাক।

মামুর অনুমান সত্য প্রমাণিত হল। যোগাযোগ হতেই মামু বলে ওঠেন, গুড নিউজ নিখিল। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

নিখিল দাস আকাশ থেকে পড়ে বলে, সব সমস্যার? মানে ওই ‘ষড়ানন রবীন্দ্রমূর্তি’ কেসটার?

—তাই তো বলছি। আমরা এই মাত্র কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এসেছি। এখনো বাড়ি যাইনি। দমদমের কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে ফোন করছি।

—কে, কেন রবীন্দ্রমূর্তিগুলো ভাঙছে তা জানা গেছে?

—তা তো গেছেই। তাছাড়া জানা গেছে ওই লোকটা হাফ-আ-ডজন মূর্তি ভাঙতে চায়। তারপর আর ভাঙবে না। ‘সিক্স ইজ হিজ লিমিট’। এছাড়া ওই ছয়টি রবীন্দ্রমূর্তির বাকি দুটো কার হেফাজতে আছে তাও জানা গেছে। আমার অনুমান সে দুটো বাড়ির যে-কোনো একটাতে আজ রাত্রে—অথবা কাল পরশুর মধ্যে বাগলারি হবে। আমি কোনো চান্স নেব না। তুমি দুটো বাড়িতেই গোপনে আর্মড গার্ড পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করো। আমি দুজনকেই খবর দিয়ে রাখছি—তারা সদর দরজা খুলে রাত্রে ঘুমাবে। লোকটাকে হাতেনাতে ধরতে হবে।

—‘লোকটা’ মানে সেই ‘অবোধ’?

—না, আমার ধারণা : লোকটার নাম ‘আউধবিহারী’। কিন্তু রঙের টেকাখানা যে আমার হাতে এসে গেছে, সেকথা এখনো তো তোমাকে বলাই হয়নি—

—রঙের টেকা! মানে?

—হোটেল হিন্দুস্তান থেকে দু-বছর আগে যে হিরের আংটিটা চুরি যায়!

—সেটা পেয়েছেন?

—হাতে পাইনি। সন্ধান পেয়েছি। বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে হাতে পাবার সম্ভাবনা। এখন তুমি ঠিকানা দুটো নোট করে নাও—সেখানে আজ রাত এগারোটা থেকে তোমাকে পুলিশ পোস্টিং করতে হবে। ‘পুলিস’ নয়, আর্মড গার্ড। লোকটার পজেশানে একটা রিভলভার আছে কিন্তু!

—মনে আছে স্যার, ঠিকানা দুটো বলুন।

মামু দেবেনবাবু আর ডক্টর অসিত দত্তের নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বর জানিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে পাপিয়া। চায়ের সঙ্গে ‘টা-ও’ এসেছে। এক প্লেট মাছের চপ।

বাসু প্রতিবাদ করেন, এটা কী হল? আমি তো তখনই বললাম....

পাপিয়া বলে, না দাদু, কেনা নয়। ঘরে করা। আমি শুধু মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করে নিয়ে এলাম।

—তা তো আনলে, কিন্তু আমার ম্যাক্রোওয়েভে পেট গরম হলে...

তুলসী বলেন, হবে না। রাত্রে না হয় ‘মিস-আ-মিল’ করবেন।

মামু বলেন, অল-রাইট। যাঁরা বাহান্ন তাঁহা পঁয়ষট্টি! রাণু না জানতে পারলেই হল। দাও প্লেটটা—

চা-পানাস্তে মামু বলেন, আর একটা কথা বলা বাকি আছে। দেবেন প্রথম প্রস্তাবেই আমার নিউ আলিপুরের বাড়িতে যেতে চেয়েছিল। আমি তখন বারণ করেছিলাম। কারণ তার আগে আমি এই নোনাপুকুরে—আই মীন, পূর্ব কালিয়াচকে—আসতে চেয়েছিলাম। তাই এখন বলছি, কাল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তোমরা আমার নিউ আলিপুরের বাড়িতে আসবে। তোমরা সবাই—দেবেন, তুলসী, পাপিয়া আর তার ওই ফুটফুটে মেয়েটা—

দেবেন বলেন, উপলক্ষটা কী?

—‘সায়মাশ’ গ্রহণ এবং একটি নিটোল গোয়েন্দা গল্প শ্রবণ। তথা একটি ম্যাজিক। এর বেশি বলব না। তবে সেখানে তোমরা দুজন পরিচিত ব্যক্তির দেখা পাবে। তাদেরও নিমন্ত্রণ করব। শ্রীরামপুরের ডাক্তার দত্ত, সস্ত্রীক।

পরদিন সকালে আমরা যখন প্রাতরাশে বসেছি, তখন এল নিখিলের ফোন।

মামু জানতে চান : কী খবর, নিখিল?

—খবর খুব ভালো, স্যার। জানি না, কী করে আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু কাল রাত্রেই শ্রীমান রবীন্দ্রারি দেবেনবাবুর বাড়িতে ‘রাতের অতিথি’ হয়েছিলেন। লোকটা হাতেনাতে ধরা পড়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে লোকটা পাক্ষা ক্রিমিনাল। সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েই গোটা দুই বার্গলারি আর একটা খুনের চার্জে ফেঁসে গেছে।

—ওর নামটা কী? অবোধ না অবুধ?

—আজ্ঞে না, কোনোটাই নয়। আপনার অনুমানই সত্য। ওর পিতৃদত্ত নাম আউধবিহারী মিশির। বিহারে বাড়ি। পটুয়াটোলার ভোলানাথ পাল ওকে দত্তক নিয়েছিলেন।

—তার মানে নাম-সংক্রান্ত যে ছোট কাঁটাটা ছিল সেটাও এখন সমূলে উৎপাটিত?

—তা তো উৎপাটিত, কিন্তু রঙের টেক্সাখানা কোথায়, স্যার? সেই হিরের আংটি?

—হবে গো হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। শোনো, আজ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তুমি আর কাকলি আমার এখানে ডিনার খাবে। আরও কয়েকজনকে বলেছি—দেবেন আর অসিতের বাড়ির সবাই আসবে। আর ডক্টর দাশগুপ্ত।

সাহেবের নিউমার্কেটের দোকানে ছদ্মবেশী বিচিত্র খরিদার আসা থেকে অরুণবাসুর বাড়িতে অনাথ নস্করের খুন হওয়া তক্।

সমাধানে কী করে উপনীত হলেন সেটা মামুই সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন :

নিউমার্কেটের প্রথম দৃশ্যের ঘটনাটা ওঁর কাছে অদ্ভুত লেগেছিল মাত্র। সেটা রহস্যময় হয়ে উঠল ডক্টর দাশগুপ্তের বাড়ি ও চেস্কার থেকে দু-দুটি রবীন্দ্রমূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ায়। বললেন, ডক্টর দাশগুপ্তের ঠিকানাটা লোকটা খুব কায়দা করে সংগ্রহ করেছিল। ভাণ্ডারীকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘ডক্টর দাশগুপ্ত মানে আমাদের গড়িয়াহাটার অমল দাশগুপ্ত? আই স্পেশালিস্ট?’ ভাণ্ডারী জবাবে বলেছিলেন, ‘আজ্ঞে না। তিনি যোধপুর পার্কের ডক্টর পি. এন. দাশগুপ্ত, কার্ডিওলজিস্ট!’

অবোধবিহারী টেলিফোন ডাইরেক্টরি হাতড়ে অনায়াসেই তাঁর বাড়ি ও চেস্কারের ঠিকানা সংগ্রহ করে ফেলল। সে যে তা করেছিল এটা মামু বুঝতে পারেন যেহেতু টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে গড়িয়াহাটা অঞ্চলে কোনো অমল দাশগুপ্ত, আই. স্পেশালিস্টের নাম পাওয়া গেল না। টেলিফোন নেই অথচ প্র্যাকটিস করেন, এমন ডাক্তার হয় না।

বাসু আন্দাজ করলেন, অবোধ কায়দা করে দেখে এসেছে ওঁর বৈঠকখানায় এবং চেস্কারে মূর্তি দুটো কোথায় রাখা আছে। হয়তো প্রথমটা সেলসম্যানের ভেক ধরে এবং দ্বিতীয়টা রোগীর আত্মীয় সেজে।

এইসময় তুলসী বাধা দিয়ে বলে ওঠে, আমি কিন্তু গল্পের ধরতাইটা ঠিক ধরতে পারছি না। ও লোকটা ক্রমাগত রবীন্দ্রনাথের মূর্তি চুরি করে যাচ্ছে কেন? কী চায় সে?

ডক্টর অসিত দত্ত বলেন, একটু ধৈর্য ধরে সবটা শোনো, তুলসী।

মামু এসব কথোপকথনে কর্ণপাত না করে বলে চলেন, আমি লক্ষ করে দেখলাম, লোকটা আর কিছু চুরি করছে না। সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও। শুধু একই মাপের, একই মডেলের, একই ব্যক্তির মূর্তি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কী কারণ হতে পারে? এমন মূর্তি তো কলকাতা শহরে কয়েক হাজার। তাহলে?

পরের ধাপেই কেসটা হয়ে গেল ‘ভাইটাল’! অরুণ বসুর সল্টলেকের বাড়িতে একটা জলজ্যান্ত মানুষ খুন হয়ে গেল। কেন? বেশ বোঝা যায়

সে-লোকটা ওর মোটরসাইকেলে চড়েই অকুস্থলে এসেছিল। কারণ, দ্বিতীয় কোনো যানবাহন ত্রিসীমানায় ছিল না। তার মানে যে লোকটা খুন হয়েছে সেই অনাথ নস্কর নিঃসন্দেহে মূল আসামীর পার্টনার-ইন-ক্রাইম! অর্থাৎ লোকটা অনাথের সঙ্গে ‘ডবল ক্রশ’ করেছে। যাতে তাকে লভ্যাংশ না দিতে হয়।

কিন্তু অরুপবাবুর ঠিকানা সে পেল কোথায়? কেমন করে জানল, তাঁর বাইরের ঘরেও ওই রকম একটি মূর্তি আছে? এটা তো তার জানার কথা নয়।

এই সময়েই আমি ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে যাত্রা করলাম।

তুলসী আবার ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ে। বলে, মানে? ‘ভাগীরথীর উৎস সন্ধান’ মানে?

—মানে ‘মহাদেবের জটা’। মূর্তির আদি উৎস : ঘূর্ণি, কৃষ্ণনগর। মহাদেব এক্ষেত্রে শিল্পী কার্তিক পাল। ... তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানা গেল এ-জাতীয় মূর্তি এ-পর্যন্ত কয়েক হাজার বিক্রি হয়েছে। তারপর ফটো দেখে যখন কার্তিকবাবু অবোধবিহারীকে শনাক্ত করতে পারলেন, তার ইতিবৃত্ত শোনালেন, তখনই মূল সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল।... বোঝা গেল, হিরের আংটিখানা গীতা নস্কর হস্তান্তর করেছিল তার দাদা অনাথকে; কিন্তু পুলিশি তদন্তের আশঙ্কায় অনাথ সেটা দিয়ে গিয়েছিল অবোধবিহারীকে। অবোধ সেটা পকেটে নিয়ে ঘূর্ণিতে পালিয়ে আসে।... এখানে আবার একটা মিসিং লিংক থেকে যাচ্ছে। মানে এখনই প্রমাণ করতে পারছি না, কিন্তু আমার অনুমান—অনাথ আংটিটা যে অবোধকে দিয়েছে সেটা জানতে পেরেছিল আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি। যে লোকটা অবোধের পিছনে লাগে। অবোধ তাকে ছুরি মেরে জেলে যায়। আহত মানুষটা হাসপাতাল থেকে বার হয়ে এসে আর অবোধের পাত্তা পায় না। অনাথ কিন্তু খবর রেখেছে—অবোধ কবে কোন জেলে ঘানি টানছে। সে ছাড়া পাওয়ামাত্র অনাথ তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু আংটিটা যে কোথায় আছে, তা বুঝতে পারে না। পিছন-পিছন ঘোরে।

আমার অনুমান : আটাত্তর সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি, শিবরাত্রির দিন অবোধ যখন পালমশায়ের স্টুডিওতে কাজ করেছিল তখন আংটিটা ছিল তারই ট্যাকে। পুলিশ-রেইড হয়েছে শুনেই সে একটা দারুণ কায়দা করে।

স্টুডিওতে তখন ছয়-ছয়টি রবীন্দ্রমূর্তির ‘প্লাস্টার কাস্ট’ প্রায় কাঁচা অবস্থায় তাঁকের ওপর সাজানো। অবোধ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তার একটার ভিতর আংটিটা ঢুকিয়ে দিয়ে টিপেটাপে ঠিক করে দেয়।... পুলিশ তাকে আংটি চুরির দায়ে খুঁজছিল না। ফলে সে-বিষয়ে কিছু তল্লাসিও হয়নি।

শম্ভুর কাছে শুনলাম, জেল থেকে ছাড়া পেয়েই অবোধ এসেছিল ঘূর্ণিতে। মালিকের সঙ্গে দেখা করেনি। কিন্তু শম্ভুর মাধ্যমে সে বুঝতে পারে সেই ছয়টি মূর্তি কোথায় কোথায় আছে। তিনটি মূর্তির সন্ধান সে আগেই পেয়েছিল। বাকি তিনটির পাত্তা পেয়ে যায়। সে পর্যায়ক্রমে অরূপ, দেবেন ও ডক্টর দত্তর বাড়িতে হানা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। অরূপের বাড়িতে যে মূর্তিটা ছিল সেটা ভেঙে সে আংটিটা পায়নি। এর পর দেবেন বিশ্বাসের বাড়ি হল তার নেস্ট টার্গেট।

বেচারির দুর্ভাগ্য—তার আগে, একই পদ্ধতিতে আমি জানতে পেরে গেলাম : ‘ষড়ানন রবীন্দ্রমূর্তি’র শেষ দুটি কোথায় আছে। বলো তুলসী এরপর তোমার আর কোনো জিজ্ঞাস্য আছে?

—আছে মামু। এবার আপনাকে একটা মোক্ষম প্রশ্ন করব। বেশ বোঝা যাচ্ছে আংটিটা এই দুটো মূর্তির যে-কোনো একটার ভিতর নিশ্চয়ই আছে। হয় যেটা আমাদের বৈঠকখানায় এতদিন রাখা ছিল—আহা! সেটা কেন এতদিন হাত থেকে পড়ে ভাঙেনি! অথবা অসিতদার মূর্তিটা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, না ভেঙে আপনি বলতে পারেন : কোন মূর্তিটার ভিতর আংটিটা আছে?

মামু হেসে বলেন, তা পারি, বইকি, মা!

—কোনটা? কীভাবে?

মামু ধীরেসুস্থে পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করে টেবিলে রাখলেন। তার ওপর চাপা দিলেন দুটি প্লাস্টার অব প্যারিসের মূর্তি—হুবহু একরকম দেখতে; ‘টুইডল্‌ডাম্’ আর ‘টুইডল্‌ডী’।

বললেন, তুলসী একটা জবর প্রশ্ন করেছে। তোমাদের মধ্যে এই মূর্তি দুটি না ভেঙে কেউ কি বলতে পার, কোনটার মধ্যে আছে সেই সওয়া দু-লাখ টাকার হারানো মালিক? সে পারবে—আন্দাজে নয়, প্রমাণ করে নিশ্চিত বলতে পারবে—সে ওই পাঁচশো টাকার নোটটা উঠিয়ে নিতেও পারবে।

কাকলি প্রশ্ন করল, মূর্তি দুটো আমরা হাতে নিয়ে দেখতে পারি?

—অফ কোর্স। তবে তার আগে আমি ওর পেছনে দেবেনের ‘D’ আর অসিতির ‘A’ চিহ্ন পেনসিলে লিখে দেব, যাতে পরে শনাক্ত করা যায়।

মামু মূর্তি দুটোর তলায় ‘A’ আর ‘D’ লিখে, মূর্তি দুটি সকলের দিকে বাড়িয়ে ধরেন। অনেকেই হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। নিখিল দেখল না। সে দু-চোখ বুজে শুধু চিন্তা করে যাচ্ছে। কীভাবে বাসুসাহেব বলতে পারছেন অথচ আর কেউ বলতে পারছে না।

মামু এই মওকায় তাঁর ভাগ্নেকে একটা খোঁচা দিলেন, কী মিস্টার সুকৌশলী? বলতে পারেন কোথায় আছে অ্যাটম-বোমার ফর্মুলাটা?

তুলসী বললে, আমরা পারছি না। আপনি বলে দিন!

মামু বললেন ‘D’ চিহ্নিত মূর্তিতে নয়। হিরের আংটিটা আছে ‘A’ চিহ্নিত মূর্তিতে। বাট মাই অফার স্টিল স্ট্যান্ডস। কীভাবে আমি তা নিঃসন্দেহে বলতে পারছি তা যদি তোমরা কেউ বলতে পারো, তবে ওই পাঁচশোটার নোটখানা তার—

কোথাও কিছু নেই রাণু মামিমা তাঁর হুইল চেয়ারের চাকায় একটা আধপাক মেরে এগিয়ে এলেন। মূর্তি দুটো সরিয়ে নোটখানা উঠিয়ে নিলেন। আঁচলে বাঁধতে থাকেন।

মামু বলেন, এই...এই, ওটা কী হচ্ছে রানু? তুমি বলতে পারো—আমি কীভাবে বলছি : আংটিটা ‘A’ মার্ক মূর্তিতে আছে?

—ওমা, তা পারব না কেন? দেবেনের বৈঠকখানা থেকে তুমি তো কাল রাতেই ‘D’ মার্ক মূর্তিটা নিয়ে এসেছ। কাল সারারাত, আজ সারাদিন সেটা ছিল তোমার হেফাজতে।

—সো হোয়াট? তাতে কী হল?

—তাই তুমি জানো যে, সেটার ভিতর আংটিটা নেই!

—কী আশ্চর্য! সেটা আমি জানব কী করে?

—বাঃ, আজ সকালেই তো দেখলাম, তুমি সেই মূর্তিটা নিয়ে গাড়ি করে একাই কোথায় যেন বেরিয়ে গেলে। ঘন্টা-কয়েক পরে ফিরে এলে। তখনই তুমি জানতে পেরেছ ওই মূর্তির ভেতরে হিরের আংটিটা নেই।

—বাট হাউ? কেমন করে?

—সহজে। তুমি ওটা কোনো এক্স-রে ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েছিলি। একটা এক্স-রে প্লেট করিয়েছ। দেখেছ, হিরের আংটিটা ওর ভিতর নেই।

বাসু-মামু এতই মুগ্ধ যে, নিজের অজান্তে তাঁর উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ হল একটি ফরাসি শব্দে : ম্যাগ্নিফিক্!

কিন্তু সেখানেই থামতে পারলেন না তিনি। পাঁচশো টাকার নোট-ধরা রাণুমামির মুঠোটা চেপে ধরে আবার বলেন, বাট হোয়াই? কিন্তু কেন?

—কী হোয়াই?

—মূর্তিটা তো আমি কিনেছি মাত্র পাঁচশ টাকায়। এক্স-রে করাতে তো খরচ পড়েছে তার অনেক-অনেক বেশি। তাহলে কেন আমি বেহুদো....

—না, তুমি যা ভাবছ সে জবাব আমি দেব না। কারণ আসল কারণটাও আমি জানি।

—আমি কী ভাবছি?

—তুমি ভাবছ, আমি জবাবে বলব, ‘তোমার কৌতূহলের বাঁধ ভেঙে গেছিল, তুমি আর ধৈর্য রাখতে পারছিলে না।’ হ্যাঁ, সেটা কারণ, কিন্তু মূল হেতু সেটা নয়!

—তাহলে মূল হেতুটা কী?

—যে হেতুতে ডক্টর দাশগুপ্ত পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। ‘তার মূল্য তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে’। ওটা একটা শিল্পকর্ম। সবচেয়ে বড় কথা : ওটা গুরুদেবের মূর্তি! দু-একশো টাকা খরচ করলে যদি সেটাকে অটুট রেখেও উত্তরটা জানা যায়, তাহলে তা জানবার চেষ্টা করবে না, তোমার মতো মানুষ?

মামু এবার আর কোনো উচ্ছ্বাস দেখালেন না। কিন্তু সহধর্মিনীর এই সহমর্মিতার কথাগুলো যে তাঁকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে, তা বোঝা গেল তাঁর নীরব আচরণে।

মামু পকেট থেকে রুমালটা বার করলেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচ দুটো সাফা করতে বসলেন।



নারায়ণ সান্যাল

সর্বশুভ্র সঙ্ঘের কাঁটা



সর্বশুভ্র সঙ্ঘের কাঁটা

স্বাধীনতা



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সর্বশুভ্র সঙ্ঘের কাঁটা

[ডয়েলিয়ান সুবিখ্যাত 'রেড-হেডেড
লিগকে 'হিন্দের বন্দী' করার প্রচেষ্টা]

তোমরা হয়তো আমাকে চেনো না। তাই নিজের পরিচয়টা প্রথমে দিই। আমার নাম কৌশিক মিত্র। শিবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই. পাস করেছিলাম; কিন্তু নানান কারণে এঞ্জিনিয়ারিংকে পেশা হিসাবে নিতে পারিনি। আমরা স্বামীত্বীতে খুলে বসেছিলাম একটা পেশাদারী গোয়েন্দা সংস্থা— ‘সুকৌশলী’। আমাদের অফিস আর আস্তানা হচ্ছে নিউ-আলিপুরে — বাসু-মামুর বাড়ির একতলার একটা অংশে। বাসু-মামু আমার নিজের মামা নন, মামাশ্বশুরও নন। তবে আমাদের খুব স্নেহ করেন। আমরা এক সঙ্গেই থাকি, এক হেঁসেলেই রান্নাবান্না হয়।

বাসু-মামুর পুরো নাম প্রসন্নকুমার বসু। ‘পি. কে. বাসু বার অ্যাট-ল’ নামেই তিনি পরিচিত। ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার। কলকাতা হাইকোর্টের বস্তুত শেষ ব্যারিস্টার। অসাধারণ তাঁর বুদ্ধি আর প্রতিপত্তি। তবে আদালতের চৌহদ্দির মধ্যে সওয়াল-জবাব করেই তিনি ক্ষান্ত হন না। নির্দোষ আসামীকে খালাস করানোতেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করেন না—আসল অপরাধীকে চিহ্নিত করে আদালতে পেশ না করা পর্যন্ত যেন তাঁর ছুটি নেই।

মামিমা একটা দুর্ঘটনায় প্রতিবন্ধী। হুইল-চেয়ারে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ান। তিনিই বাসু-মামুর প্রাইভেট সেক্রেটারি। এ ছাড়া বাড়িতে আছে আমাদের একজন কন্সাইন্ড-হ্যান্ড—বিশ্বনাথ : বিশেষ। সম্প্রতি আমাদের ছোট মেয়ে, মিঠুকে দেখভাল করার জন্য বহাল করা হয়েছে বিশুর এক দিদিকে : ফুটকি।

পরিচয়-পর্ব শেষ করার এবার আসল গল্পটা শুরু করি :

সেদিন সকালে বাসু-মামুর চেম্বারে ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। দেখতে পাই ঘরে একজন ক্লায়েন্ট বসে আছেন। মামুর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে।

‘আয়াম সরি’—বলে ফিরে আসার উপক্রম করতেই মামু বললেন, যেও না, কৌশিক। তোমাকেই ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। এস, আলাপ করিয়ে দিই। এঁর সমস্যাটা কোর্ট-কাছারি সংক্রান্ত নয়—তোমাদের সুকৌশলীর এজ্জিয়ারে। বোসো,—এঁর নাম মিস্টার হরিনাথ কুণ্ডু। নামটা চেনা-চেনা লাগছে, তাই নয়?

আমি কুণ্ডু-মশাইকে নমস্কার করি, উনিও চেয়ার থেকে উঠে আমাকে প্রতিনমস্কার করে আবার বসে পড়েন। আমি আসন গ্রহণ করে বাসু-মামুর প্রশ্নের জবাব দিই—না, এঁকে চিনি না, তবে এঁর নামে আর একজনকে চিনতাম। তিনি প্রফেসর ছিলেন।

মামু বললেন, একজ্যাক্টলি। নামটা শুনেই আমার সেই ‘মহেশের মহাযাত্রা’র কথা মনে পড়ে গিয়ে ছিল : ‘হরিনাথ কুণ্ডু/খাই তোর মুণ্ডু!’

আমি বলি, না, মামু! প্রফেসর মহেশচন্দ্র ‘সেকেন্ড থট’-এ কবিতার পংক্তি দুটো বদলে করেছিলেন : ‘কুণ্ডু হরিনাথ/মুণ্ডু করি পাত।’

মামুর ক্লায়েন্ট একবার ওঁর দিকে একবার আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আমি স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মুণ্ডু চিবানোর কথা...

মামু ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, না, না, আপনার মুণ্ডু কেন হবে? সে অন্য এক হরিনাথ কুণ্ডুর মুণ্ডু। ও প্রসঙ্গ থাক। আপনি কৌশিককে আপনার সমস্যার কথাটা সবিস্তারে বলুন। আমি একবার অবশ্য তা শুনেছি, দ্বিতীয়বার শুনলে, বুঝতে পারব, কোনো ডিটেইলস বাদ গেল কি না। কিন্তু তার আগে কাগজের ওই কাটিংটা ওকে দেখান।

একটা কথা বলতে ভুলেছি : সাতসকালের এই ক্লায়েন্টটির চেহারার বৈশিষ্ট্য। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের উপর, পরনে একটা খেটো ধুতি। গায়ে গলাবন্ধ আলপাকার কোট। পায়ে কাবুলি-চপ্পল, চোখে নিকেলের চশমা, আর তাঁর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি আগা-পাছ-তলা ধবধবে সাদা। সারা গায়ে লোম নেই। সারা মাথার চুল, কপালের ভুরু, এমনকি চোখের রোঁয়াও সাদা। ইংরেজিতে এঁদের বলে ‘অ্যালবিনো’। শ্বেত, নয়,

শ্বেত একটা অসুখ—এ হচ্ছে প্রকৃতির অদ্ভুত এক খেয়াল। জন্মগত। ‘জিনস’-এর কীরকম কী হেরফের এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করে। শুধু মানুষই বা কেন? সাদা বাঘ, সাদা কাকও ‘অ্যালবিনো’ হতে পারে। তবে শ্বেতভল্লুক, রাজহাঁস বা স্প্লিটিস কুকুর ‘অ্যালবিনো’ নয়। তারা প্রজাতিগত ভাবে সবাই সাদা।

মামুর নির্দেশ মোতাবেক কুণ্ডুমশাই তাঁর কোটের পকেট থেকে একটি খবরের কাগজের কাটিং বার করে দেখালেন। বিজ্ঞাপনের পুরো একটা পাতা। লাল-পেনসিলে ‘বিস্মিং’ করা বিজ্ঞাপনটি খুঁজে নিতে সময় লাগল না।

মামু বললেন তুমি নিজেই পড়। জোরে জোরে।

লক্ষ্য করে দেখলাম, সেটা ‘বর্তমান’ পত্রিকা। দু-মাস দশদিন আগেকার কাগজ। বিজ্ঞাপনটা পড়তে হল আমাকে। জোরে জোরে :

সর্বশুভ্র সঙ্ঘের নিবেদন :

সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘগুরু স্বর্গীয় অলকেন্দুনাথ জানা-মহাশয় প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টের নির্দেশ মতে জানানো যাইতেছে যে, ‘সর্বশুভ্র সঙ্ঘের’ জনৈক সভ্যের স্বর্গারোহণে একটি সদস্যপদ খালি হইয়াছে। কলিকাতাবাসী এবং বাঙালি কোনো সর্বশুভ্র ব্যক্তি এই সদস্যপদের জন্য আবেদন করিতে পারেন। আবেদনকারীর বয়স একুশ পূর্ণ হওয়া চাই। ন্যূনতম শিক্ষার যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সর্বশুভ্র বা Albino রূপে জন্মগ্রহণ করা। দরখাস্ত সমেত আবেদনকারী আগামী রবিবার সকাল এগারোটায় স্বয়ং নিম্নোক্ত ঠিকানায় ইন্টারভিউ দিতে আসিবেন। কোনো সুপারিশপত্র আনিলে আবেদন অগ্রাহ্য হইবে। বেতন সপ্তাহান্তে নয়শত পঞ্চাশ টাকা। দৈনিক কার্যকাল চারঘণ্টা। সচিব/স. শু. স

বিজ্ঞাপনের নিচে একটি ঠিকানাও দেওয়া আছে। সাতচল্লিশের তিন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট/রুম নং তের, ত্রিতল।

আদ্যোপান্ত দু-দুবার পাঠ করে আমাকে বলতে হল, এর মাথামুণ্ড কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

মামু বলেন, তা যদি যেত তবে 'সুকৌশলী'কে তলব করব কেন? সবটাই রহস্যঘন। আমিও মাথামুণ্ডু কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। নাউ মিস্টার কুণ্ডু, আপনি সবিস্তারে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাটা আবার বলুন।

কুণ্ডু-মশাই একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন। অনেক-অনেক কথা তিনি বলে গেলেন, যার সারাংশ একরকম :

কুণ্ডু-মশাই একা-মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। উত্তরাধিকার সূত্রে একটি ছোট দ্বিতল বাড়ির মালিক। ঠিকানা একের-তিন সতীশ পতিতুও সেকেন্ড বাই-লেন। একতলায় একখানা ঘর—সেটা ওঁর ফটোর দোকান। উনি পেশায় ফটোগ্রাফার। সে ঘরেই ফটো-তোলায় যাবতীয় আয়োজন। পিছনে একটা ছোট ঘর—ডার্করুম। তার পাশ দিয়ে দ্বিতলে যাবার সরু সিঁড়ি। দোতলাতেও একখানি মাত্র ঘর। সেটা ওঁর শয়নকক্ষ। একতলা ও দোতলায় পৃথক শৌচাগার ও স্নানাগার আছে। সংসারে উনি একেবারে একা। একটা কাজের মেয়ে রোজ বিকালে এসে ঘরদোর ঝেড়ে মুছে দেয়। সামনের পাইস হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে। তারাই টিফিন-ক্যারিয়ারে করে দুবেলা খাবার পৌঁছে দিয়ে যায়। অবশ্য মাস-তিনেক হল উনি একজন সহকারীকে নিয়োগ করেছেন। বন্ধিম রায়, বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স। রাত্রে সে শোয় দোকানঘরে। সেও ফটোগ্রাফার। তবে দোকান খুলতে পারেনি। ফটো-ডেভালপিং, প্রিন্টিং-এর কাজ ভালই জানে।

এই পর্যায়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বন্ধিমবাবুকে আপনি কত মাহিনা দেন?

—দুশো টাকা, মাসে।

অবাক হতে হল। মাত্র দুশো টাকা মাস-মহিনায় কাজের লোক বা রান্না করার লোকই আজকাল পাওয়া যায় না। কিন্তু কুণ্ডু-মশাই বুঝিয়ে বললেন, ছেলেটির থাকা-খাওয়ার খরচা উনিই বহন করেন। ওই এলাকায় একটা মাথাগোঁজার ঠাই জোগাড় করতেই মাসে হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে।

আমাকে প্রশ্ন করতে হল, এলাকাটা কোথায়? সতীশ পতিতুও সেকেন্ড বাই লেন তো আর চৌরঙ্গী বা রাসবিহারী অ্যাভিনিউ নয়।

কুণ্ডু-মশাই বুঝিয়ে বললেন, ওটা ভবানীপুরে, যদুবাবুর বাজারের কাছাকাছি, এ-বি.সি ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা হচ্ছে ওঁর সেই সেকেন্ড

বাই লেন। ট্রামরাস্তা থেকে হাঁটাপথে দেড় মিনিটও হবে না। ব্যাক্সের ঠিক পিছনেই। একেবারে লাগোয়া।

মামু বললেন, আপনি বক্সিমের কথা বিস্তারিত বলুন বরং। মাস-তিনেক আগে ওকে চাকরিতে বহাল করলেন কার সুপারিশে?

—আজ্ঞে না, সুপারিশ-টুপারিশ ছিল না কারও। ছোকরা এসেছিল একটা ফটো রিল ডেভালপ করতে। তা আমি বললাম দু-দিন পরে এসে ডেলিভারি নিও। ছোকরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, স্যার, এটা একটা ম্যারেজ-পার্টির রিল। বর-কনে কালকের ফ্লাইটেই আমেরিকা চলে যাবে। পাত্র এন. আর. আই। আজ রাত্রে মধ্য ডেভালপিং, প্রিন্টিং, এনলার্জমেন্ট সব করে ওঁদের ডেলিভারি দিতে পারলে মোটা বকশিস পাব। তা আমি বললাম, এখন আমার সময় নেই। ছোকরা বললে, আপনি স্যার, ডার্করুমটা খুলে দিন, কোথায় কী আছে আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি ঘণ্টা দু-তিনের মধ্যে নিজেই সব করে নেব। আমি হেসে বলি, তুমি আমার ডার্করুমে গিয়ে কিছু হাতিয়ে নিলে, আমি কি টের পাব? ছোকরা নিক্কথায় তার ব্যাগ খুলে দু-দুটো ক্যামেরা বার করে আমার কাছে গচ্ছিত রাখল। একটা ক্যানন একটা ইয়াসিকা! করজোড়ে বললে, ‘প্লিজ স্যার!’

বুঝতেই পারছেন, দু-দুটো ক্যামেরার যা দাম তার সমতুল্য কিছু নেই আমার সেটা ডার্করুমে—মানে আলমারি-বন্ধ অবস্থায় যা আছে তা বাদে।

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, বুঝলাম। এভাবেই আলাপ হল, বিশ্বাস জন্মাল। কেমন?

—ইয়েস স্যার! ছোকরা কাজ জানে, কিন্তু ক্যাপিটাল নেই। নিজে দোকান খুলে বসার সঙ্গতি নেই। এদিকে আমার বয়স হয়েছে। ছোট্টাছুটি করতে পারি না। দোকানটা দু-পুরুষের। বাবার একটা পুরনো ‘জাইস আইকন’ ক্যামেরাও আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। কিন্তু তাতে অ্যাটাচড ফ্ল্যাশ-বাল্বের ব্যবস্থা নেই। এমন মাস্কাতা আমার ক্যামেরা নিয়ে কি আজকালকার দিনে ব্যবসা করা চলে? বক্সিম এখন সব কাজ করে। আমার পুরনো খদ্দের অনেক আছে। আমি ‘অর্ডার’ এনে দিই, আর বক্সিম দৌড়ঝাঁপ করে। দারুণ হাত ছেকরার। আমাকে কিছু করতেই দেয় না। এ-ছাড়া আমায় ইলেকট্রিক বিল টেলিফোনের বিল জমা দেওয়া—মানে যাবতীয় কাজ ও করে দেয়। বলছে, পরের মাসে একটা স্টোভ আর

ইকমিক-কুকার কিনবে। টাকা আমিই দেব। তাহলে হোটেলের খাবার আর খেতে হবে না আমাদের দুজনকে।

মামু আবার বাধা দিয়ে বললেন, বন্ধির্মের পরিচয় আপনি বিস্তারিত দিয়েছেন। এবার আপনার সমস্যার কথাটা বলুন।

উনি রাজি হলেন না। বললেন, তার আগে বলুন, স্যার, আপনার অ্যাডভাইজ নিলে আপনাকে কত কী দিতে হবে? আমি গরিব মানুষ—কাঁটা-সিরিজের কিছু বই পড়ে আমার মনে হয়েছে, হয়তো আপনি আমার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবেন। কিন্তু আপনার মতো লোকের সম্মান দক্ষিণা—

বাসু-মামু আবার বাধা দিয়ে বলেন, আপনি সে নিয়ে চিন্তা করবেন না, হরিবাবু। আপনার গল্পটা আমার এমনই রহস্যঘন মনে হয়েছে যে, আমি কোনো ফিই নেব না। এবার শুরু করুন—

উনি আবার ফিরে গেলেন ওঁর সেই রহস্যঘন কাহিনিতে।

মাস-দুই আগে বন্ধিমই ওঁকে বিজ্ঞাপনটা এনে দেখায়। বলে, দেখুন স্যার। এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখুন। আমার তো মনে হচ্ছে আপনার ছপ্পড়-ফোড় সৌভাগ্য এসে গেছে। এই চাকরিটা বাগাতে পারলে আপনার সব দুঃখকষ্টের অবসান হবে। সপ্তাহে নয়শত পঞ্চাশটাকা মানে মাসে প্রায় চার হাজার টাকার কাছাকাছি। আমরা তাহলে আর ইকমিককুমারে যাব না। প্রেশারকুকারই একটা কিনব। ইন্সটলমেন্টে একটা ফ্রিজও কিনে ফেলতে পারি—কী বলেন?

তা আমি বললাম, ব্যাপারটা কী? ‘সর্বশুভ্র সজ্জের’ নামই শুনিনি আমি!

বন্ধিম স্বীকার করল, সেও শোনেনি। তবে ওর মতে আমার মতো ‘সর্বশুভ্র’ মানুষ সে খুব কমই দেখেছে। ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে দেখতে দোষ কী?

মোটকথা রবিবার সকালে ওঁরা বাসে-চেপে চলে গেলেন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে। বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় পৌঁছে ওঁরা তো তাজ্জব। কলকাতা শহরে যে এত ‘অ্যালবিনো’ মানুষ আছে তা জানাই ছিল না। সবাই ভিড় করেছে চিহ্নিত বাড়িটার সামনে। নেহাৎ রবিবার—ওল্ড কোর্ট হাউসের অধিকাংশ দোকানই বন্ধ, হাইকোর্ট-এও ছুটি। না হলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যেত। সিঁড়ির এক পাশ বেয়ে এক দল সর্বশুভ্র মানুষ উপরে উঠে যাচ্ছে,

অপর পাশ দিয়ে বিষণ্ণ, যুদ্ধক্লান্ত ব্যর্থ সর্বশুভ্রের দল নেমে আসছে। কে ইন্টারভিউ নিচ্ছে কী বিচার করছে, খোদায় মালুম কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে এই ওঠানামার খেলা চলেছে। বক্ষিম করিৎকর্মা মানুষ। কনুইয়ের গুঁতোয় কুণ্ডু-মশায়ের চক্রব্যূহে প্রবেশের পথটা বানিয়ে ফেলল। হরিনাথবাবু সিঁড়ির একটি ধাপে শামিল হলেন। তারপর ‘গুজ স্টেপে’ গুটি গুটি উপরপানে চলতে থাকেন। দারোয়ান বক্ষিমকে লাইনে দাঁড়াতে দিল না। তার গাত্রবর্মের পাসপোর্ট না থাকায়।

অবশেষে ইন্টারভিউ বোর্ড-রুমে পৌঁছলেন। নাম ডাকাডাকির বালাই নেই। তবে দরজার সামনে তকমা-আঁটা একজন প্রহরী আছে। একটি একটি করে কর্মপ্রার্থীকে সে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে। ঘরের ও-প্রান্তে বোধহয় একটি প্রস্থানদ্বার আছে। কারণ ঘরে সর্বশুভ্রের দল ক্রমাগত ঢুকেই যাচ্ছে, বার হয়ে আসছে না কেউ। পর্দা সরিয়ে দারোয়ান ভিতরটা দেখে নিয়ে হরিবাবুকে বললে, অব যাইয়ে।

হরিবাবু সশঙ্কচরণে ঘরে প্রবেশ করলেন। ছোট ঘরটা। তার মাঝখানে একটা টেবিলের ও-প্রান্তে বসে আছেন একজন সর্বশুভ্র ভদ্রলোক। কোট-প্যান্ট-টাই পরা। তার পাশে আর একজন ভদ্রলোক। তিনি কিন্তু অ্যালিবি নন। কালো। হরিবাবু হাত তুলে দুজনকে নমস্কার করলেন।

—প্লিজ সিট ডাউন।

দরখাস্তটা দাখিল করে হরিবাবু বসলেন। কালোবাবু একটা খাতায় কী যেন লিখে নিলেন। ওঁর দরখাস্তটা ফাইলজাত করলেন। সর্বশুভ্র ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হরিবাবুকে ঘুরে ফিরে দেখলেন। হাতটা তুলে নিয়ে ভাল করে গাত্রবর্ণ পরীক্ষা করে মনে হল তিনি সন্তুষ্ট হলেন। জানতে চাইলেন, আপনার বাড়িতে আর কে-কে আছেন?

হরিবাবু বললেন, আজ্ঞে না, আর কেউ নেই। আমি একাই থাকি।

—ও! তা চাকরিটা পেলে আপনি কতদিন পরে যোগ দিতে পারবেন?

হরিবাবু বললেন, কালই পারি, কিন্তু আমার কাজটা কী জাতের? কী করতে হবে আমাকে?

—বিশেষ কিছু নয়। কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের একটা হাতে-লেখা কপি বানানো। আপনার প্রেডিসেশন—মানে, যিনি স্বর্গত হওয়ায় এই ভেকেসিটা হয়েছে, তিনি বোধহয় আদিকাণ্ডটা শেষ করে গেছেন। আপনাকে

অযোধ্যাকাণ্ড থেকে শুরু করতে হবে। কাগজ আমরা দেব, কলম আপনার নিজের। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বেলা দুটো এই ঘরে বসে কপি করে যাবেন। দুটো ঘণ্টা সময় আমি বা আমার লোক এলে তার হাতে জমা দেবেন। ব্যস। আর কিছু নয়।

হরিবাবু বললেন, একটা জিনিস আমি বুঝতে পারলাম না। এ কাজে কার কী লাভ হবে? আর সেজন্য মাসে মাসে আপনারা কেন একজন লোককে প্রায় চার হাজার টাকা মাহিনা দেবেন?

ভদ্রলোক বললেন, আমি এই ‘সর্বশুভ্র সঙ্ঘের’ কলকাতা শাখার সচিব। আমার নাম গঙ্গারাম হোড়। আপনাকে সব কথাই বুঝিয়ে দেব। কিন্তু আপনাকে চাকরিটা দিলে আপনি কি গ্রহণ করতে স্বীকৃত?

হরিবাবু বললেন, সেটা নির্ভর করছে আপনার ব্যাখ্যার উপর। দৈনিক চারঘণ্টা লেখা কপি করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু কেন এ-কাজ করছি, তা না জেনে কেমন করে স্বীকার করি?

—আপনি কি অলকেন্দু জানা-মশাইয়ের কথা জানেন কিছু? যিনি আমাদের সঙ্ঘগুরু?

—আজ্ঞে না।

—শুনুন তবে।

হরিবাবু শুনলেন, অলকেন্দু জানা ছিলেন কলকাতারই ছেলে। পড়াশোনায় ভালো, সুন্দর স্বাস্থ্য, কিন্তু ‘অ্যালবিনো’ হওয়ায় কলকাতায় তিনি বিয়ে-থা করতে পারেননি। সংসার পাততে পারেননি। জাহাজের খালাশির চাকরি নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দেন। সেখানে নানান ব্যবসা করে শেষে কোটিপতি হয়ে যান। সংসার তিনি আদৌ করেননি। মৃত্যুকালে তাঁর কোনও ওয়ারিশ ছিল না। তিনি একটি ট্রাস্ট গঠন করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এই সর্বশুভ্রসঙ্ঘকে দিয়ে যান। তাঁর মতে ‘অ্যালবিনো’ হয়ে জন্মানো কোনো পাপকাজ নয়, কারও হাতেও সেটা নেই। এ যেন সেই দ্বিজেন্দ্রলালের গান : ‘পার’ তো জন্ম না কো বিঘুৎবারের বার-বেলায়।’ আরে বাবা জন্মানো কি কারও নিজের হাতে? তাই সঙ্ঘগুরু এই ব্যবস্থা করে গেছেন। ‘অ্যালবিনো’-জাতকে তিনি সাহায্য করে যাবেন। তবে ‘ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’। তাঁদের কোনো কিছু সৎ কাজ করে অর্থটা উপার্জন করতে হবে। রামায়ণ কপি করা সৎ কাজ। তাই এ ব্যবস্থা।

হরিবাবু বললেন, এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলাম। আমি স্বীকৃত।

—আপনি কিন্তু প্রথম একমাস কোনো ছুটি চাইতে পারবেন না। রোববারেও নয়। এই হচ্ছে চাকরির শর্ত। তারপর আমাদের সজ্জের অনুমোদিত সার্ভিস-রুলস মোতাবেক ছুটি পাবেন, ইনক্রিমেন্ট পাবেন, মায় পূজায় বোনাসও পাবেন।

কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নেড়ে বললেন, তাই সই।

হোড়-মশাই এবার তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে বললেন, কংগ্র্যাচুলেসন্স মিস্টার কুণ্ডু! ইউ আর সিলেকটেড! আপনি এই কাগজখানায় সই করে দিন। আমরা এটা হেড-অফিসে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব। মাসখানেকের মধ্যে আপনার এই টেম্পরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট কনফার্মড হয়ে আসবে। পাকা নিয়োগপত্র পাবেন। কিন্তু আপনি কি কাল থেকেই কাজে যোগ দিতে চান? নাকি দু-চার দিন বাদে?

কুণ্ডু বললেন, কালই কেন নয়? দৈনিক একশ সাঁইত্রিশ টাকা ছাড়ব কেন?

—তাহলে কাল সকাল দশটায় এখানে এসে যাবেন। রাম সিং থাকবে। আপনাকে দরজা খুলে দেবে। কাগজের জোগান দেবে। ফাই-ফরমাসও খাটবে। সকাল দশটা থেকে বেলা দুটো।

হরিবাবু দারোয়ানের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। সে সসম্মুখে নত হয়ে সেলাম জানাল।

চাকরি পাকা করে নিচে নেমে এসে দেখলেন সর্বশুভ্রের ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেছে। রাম সিং ইতিমধ্যে তাঁদের গুনিয়ে দিয়ে গেছে, এক সফেদবাবুকো নোকরি মিল গয়্যা! আপ লোক আপনা আপনা কাম মে যাইয়ে।

বন্ধিম তো আহ্লাদে আটখানা। বলে, চলুন স্যার, মিষ্টিমুখ করিয়ে দিন।

কুণ্ডু-মশাই বললেন, দেব হে দেব। তবে না আঁচালে বিশ্বেস নেই। প্রথম হপ্তার মাইনেটা আগে হাতে পাই।

তা পেলেন। সাত দিনের মাথায় হোড়-মশাই নিজে এসে কড়কড়ে নোট গুনে গুনে ন শো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে রসিদ এবং কাগজের বান্ডিলগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন। দরোয়ান প্রতিদিন দশটায় হাজিরা দেয়। কুণ্ডুবাবু

চাইলে পান-সিগ্রেট-চায়ের জোগান দেয়। বেলা দুটো বাজলে ফ্যান-আলোর সুইচ অফ করে ঘরে তালা দেয়। সেলাম করে বিদায় নেয়।

পাঁচ-পাঁচটি সপ্তাহ নির্বিঘ্নে কাটল। অযোধ্যাকাণ্ড নয়। কুণ্ডুমশাইকে শুরু করতে হয়েছিল কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড থেকে। ওঁর পূর্ববর্তী করণিক কতদূর কপি করেছেন তার নির্দেশ ছিল রামায়ণ-ফাইলে।

গোল বাধল গত সোমবার। কুণ্ডু-মশাই অফিসে এসে দেখলেন রাম সিং অনুপস্থিত। ঘর তালাবন্ধ। আর একটি পিসবোর্ড সেলোটোপ দিয়ে দরজায় আটকানো। তাতে লেখা :

“সর্বশুভ্রসঙ্ঘের এই অফিস স্নানান্তরিত করা হইয়াছে। সঙ্ঘসচিবের সহিত যোগাযোগ করুন।”

কুণ্ডুমশাই তো আকাশ থেকে পড়েন। সঙ্ঘসচিবের ঠিকানা বা টেলিফোন নম্বর তাঁর জানা নেই। নিয়োগপত্রে এই বাড়ির ঠিকানাই শুধু লেখা আছে। উনি আশপাশের দু-চারটি খুপরিতে খোঁজ-খবর করে কোনও সন্ধান পেলেন না। সর্বশুভ্রসঙ্ঘ অফিসের নামই কেউ শোনেনি। তবে হ্যাঁ, একজন সর্বাপ্তে শ্বেতি-ওয়ালা লোককে অনেকেই ওই তেরো নম্বর চেম্বারে যাতায়াত করতে দেখেছে। কুণ্ডুবাবু ছাড়া আর একজনকে। তিনি কেন আসতেন, কী নাম—এসব কেউই কিছু জানে না। তাঁদের ইন্টারভিউ হয়েছিল রবিবারে। সেদিন পাড়াটা ছিল সুনসান। কেউ কিছু জানতে পারেনি।

কী করবেন স্থির পারলেন না। বোকা হয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে।

বন্ধিম সব কথা শুনে খেপে আগুন। বলে, মামদোবাজি নাকি? আপনি ভাল মানুষ বলে খোঁজখবর নিতে পারলেন না। আসুন তো আমার সাথে? চলুন তো দেখি—

আবার দুজনে বাসে করে ফিরে গেলেন হাইকোর্ট-পাড়ায়। বন্ধিম করিৎকর্মা ছেলে। খুঁজে খুঁজে ওই বাড়ির ম্যানেজার বা কেয়ারটেকারের পাত্রা পেল। যাঁকে সবাই ভাড়া দেয় সেই মুনিমজিকে। তাঁর গদি চারতলায়। অবাঙালি। তিনিও অবাক হলেন। বলেন, ‘সর্বসুভরো সঙ্ঘ! আজীব বাত! ম্যায়নে কভি নেই শুনা বহ নাম! ওঁর কোই গঙ্গারামজিকো ভি ম্যায় নেহি পহছত্তা!’

বঙ্কিম বলে, আপনার মোকামের তিন তলায় তেরো নম্বর ঘরের ভাড়াটের নাম গঙ্গারাম হোড় নয়? ঐরই মতো সাদা চামড়া, সাদা চুল, সাদা ভুরু?

—অব সামঝা! লেকিন বহ তো হ্যাঁ প্রফেসর ঘোষ সাব!

বুঝিয়ে বললেন, কুণ্ডুমশায়ের মতো বিলকুল সফেদ চামড়ার এক ভদ্রলোক তিনমাসের আগাম কিরিয়া দিয়ে ওই তেরো নম্বর ঘরখানা ভাড়া নিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন প্রফেসর গণেশ ঘোষ! রোজ সন্ধ্যাবেলা তাঁর টিউটোরিয়াল ক্লাস বসত। পাঁচ-সাতজন যুবক সমবেত হত। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত নয়টা। রুদ্ধদ্বার কক্ষে পড়িলিখি হত।

বঙ্কিম বলে, লেকিন দিনের বেলা? সকাল দশটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত সেখানে ক্যা হোতা থা? ছুঁচোর কেত্তন?

‘ছুঁচোর কেত্তন’ কথাটা মুনিমজির মালুম হল না। বললেন, ম্যায় নেহি জানতা, জি!

তবে সেই প্রফেসর ঘোষ ঘরখানা ছেড়ে দেবার আগে তাঁকে একটি ভিজিটিং কার্ড দিয়ে গেছেন—ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস হিসাবে, অর্থাৎ কোনো চিঠি এলে যাতে রি-ডাইরেক্ট করা যায়। কার্ডখানা মুনিমজি দেখালেন :

প্রফেসর গণেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ., পি-এইচ ডি

১৩/২ চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ

কলকাতা ২০/ফোন : ২৪৭৫-৮৪৬৪

বঙ্কিম কুণ্ডুবাবুকে সঙ্গে করে নিচে নেমে এল। একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে জানল, কার্ডে লেখা নম্বরের বাড়িতে যাঁরা থাকেন তাঁরা কেউ গণেশ ঘোষকে চেনেন না। নাছোড়বান্দা বঙ্কিম এবার ট্যাক্সিতে কুণ্ডুমশাইকে তুলে নিয়ে ভবানীপুরে নিয়ে এল। অনেক সন্ধান করে দেখা গেল, ওই রাস্তায় তেরো নম্বর বাড়ি আছে, তেরো-বাই-এক আছে; কিন্তু ১৩/২ চিহ্নিত কোন বাড়ি নেই। ১৩/১-এর পর ১৪। তাছাড়া সে-পাড়ায় প্রফেসর গণেশ ঘোষকে কেউ চেনে না। তা কলকাতা শহরে কে কার খবর রাখে? কিন্তু পাড়ার রাস্তা দিয়ে কোন সর্বশুভ্র ‘অ্যালবিনো’ মানুষ যাতায়াত করলে, তাঁর অস্তিত্বটা কি গোপন রাখা যায়? বঙ্কিম বুঝতে পারে, সেই ভদ্রলোক—খোদায় মালুম তিনি গঙ্গারাম না গণেশ—এ পাড়ায় কোনদিন পদার্পণ করেননি। তাহলে?

কাহিনি আদ্যন্ত শুনে আমি কুণ্ডুবাবুকে বললাম, কিন্তু আপনার সমস্যাটা কী? কোনোভাবেই কেউ তো আপনার কিছু ক্ষতি করেনি। ‘সর্বশুভ্রসঙ্ঘ’ বাস্তবে থাক বা না থাক,—আপনাকে ওরা দেড় মাসে প্রায় ছয় হাজার টাকা মাহিনা দিয়েছে। নামমাত্র পরিশ্রমে। তাছাড়া হয়তো আপনার কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও হয়েছে। সপ্তাহে সাত দিনই রামায়ণ পাঠ করেছেন, কপি করেছেন। এতে আপনার ক্ষতিটা কোথায়?

—বাঃ! আমার এমন সুন্দর চাকরিটা ‘নট’ হয়ে গেল, আর আপনি বলছেন ‘ক্ষতিটা কোথায়’?

বাসুমামু বাধা দিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই বলছেন মিস্টার কুণ্ডু। ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়। নিতান্ত সিরিয়াস। আপনি ‘কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড’ কপি করছিলেন বটে; কিন্তু কলকাতা শহরটা কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে নয়। এখানে কেউ অহেতুক বাঁদরামো করে না, করবে না। সঙ্ঘগুরু অলকেন্দু জানা বাস্তবে ‘অলীকেন্দু অজানা’! কিন্তু কার মাথা থেকে তিনি পয়দা হলেন? কেন হলেন? কয়েকজন লোক এমন সুচারু পদ্ধতিতে কী উদ্দেশ্যে পাঁচ-সাত-দশ হাজার টাকা লোকসান দিয়ে রাতারাতি কপূর হয়ে গেল? ইটস নো জোক!

—বলুন তো স্যার। মাসান্তে নগদ প্রায় চার হাজার টাকার চাকরিটা কপূর হয়ে গেল, আর উনি বলছেন, এতে আপনার ক্ষতিটা কোথায়?

বাসু মামু জানতে চাইলেন, কোনো ক্লায়েন্ট যখন ‘এক্সপোজড রিল’, জমা দেয় তখন আপনি নিশ্চয় একটা করে রসিদ দেন, তাই নয়?

কুণ্ডুবাবু বললেন, এই তো দেখুন না স্যার—ছাপানো রসিদ বই আমার সঙ্গেই আছে।

কোটের পকেট থেকে একটা রসিদ বই বার করে দেখালেন। রসিদে ছাপা হরফে দোকানের নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার, আর একটা ক্রমিক সিরিয়াল। মামু বললেন, আজ শনিবার। আপনি গত বেস্পতিবারের তারিখে আমাকে একটা রসিদ লিখে দিন তো—যেন আমি আপনাকে একটা ‘এক্সপোজড রিল’ ডেভালপ করতে দিয়েছি। 120 সাইজের রিল, এক কপি করে হাফ সাইজ প্রিন্টসহ। ডেট-অব-ডেলিভারি : শনিবার, অর্থাৎ আজ।

কুণ্ডুমশাই প্রথমটা অবাক হয়ে বললেন, তাতে কী হবে? তারপরই সামলে নিয়ে বললেন, সরি স্যার, আপনার প্ল্যান প্রোগ্রাম প্রথমটা বোঝা যায় না—কাঁটা-সিরিজের বইতে দেখেছি।

কুণ্ডুমশাই রসিদটা কেটে দিলেন।

মামু বললেন, দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে?

কুণ্ডুমশাই এবারও প্রশ্নের ধরতাইটা ধরতে পারেন না। বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন। মামু বলেন, আপনার সমস্ত অভিজ্ঞতাটা দু-দুবার শুনে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। হয়তো সেই উদ্দেশ্য নিয়েই একজন অ্যান্টিসোশ্যাল আপনাকে দিয়ে কিঞ্চিৎক্যা-নাচ নাচিয়েছে। সেই অনুমানটা সঠিক কিনা আমি যাচাই করতে আপনার দোকানে এখনই একবার যাব। বন্ধিমের সঙ্গে দেখা করব। একান্তে ফলে, আপনি এখন, বাড়ি যাবেন না। আপনি যে আমার কাছে এসেছিলেন সেটাও ওকে বলবেন না। সোজা দক্ষিণেশ্বরে চলে যান। পূজো দিয়ে, প্রসাদ নিয়ে বেলা তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরবেন। বুঝেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ তো সোজা কথা।

—বন্ধিমকে এখন বাড়িতে পাব তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পাবেন। সে রান্না-বান্না করছে। সদরদরজায় একটাই চাবি। সেটা আমার ট্যাকে। ডার্করুমের চাবি শুধু ওর কাছে। ফলে, সে বাড়িতেই আছে। বেরুতে পারবে না।

—ঠিক আছে। তাহলে দুর্গা দুর্গা, আই মিন, কালী, কালী বলে আপনি দক্ষিণেশ্বর পানে রওনা দিন।



বাধ্য হয়ে আমাকে ফিয়াট গাড়িটা বার হতে হল। বাসুমামুকে নিয়ে। কোথায় যাচ্ছি এইমাত্র শুনেছি, কেন যাচ্ছি সেটা জানি না। গোয়েন্দাদের এই এক ঢং। মাঝে মাঝে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বৃন্দ হয়ে যান। কিছু জানতে চাইলে বেজার হন। শার্লক হোমস, আরকুল প্যেরো, ব্যোমকেশ, ফেলুদা সবারই এই এক বদ-অভ্যাস। দ্যাখ-না-দ্যাখ : ধ্যানস্থ!

কিন্তু একটা কথা! রহস্যের যতটা আমি জানি, বাসু-মামুও ঠিক ততটাই জানেন। একটুও বেশি নয়। তাহলে আমি কেন এমন অথৈজলে হাবুডুবু খাচ্ছি, আর উনি একটা সূত্র খুঁজে পেয়ে কাজ শুরু করে দিলেন? আমি শুধু ভয়ে ভয়ে একবার জানতে চেয়েছিলাম, কিছু আন্দাজ করতে পারলেন, মামু?

পাইপটা ধরাতে ধরাতে উনি বললেন, হুঁ! এখনও এটা আন্দাজের পর্যায়েই আছে, যেহেতু সমস্ত কুণ্ডলো ওই একই পথের ইঙ্গিত দিচ্ছে!

কু? কোথায় কু? আমার তো একটাও নজরে পড়েনি। সবটাই তো কিস্কিন্ধ্যা-কাণ্ড!

মামুর নির্দেশমতো যদুবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা বারোটা। এ-বি-সি ব্যাঙ্কের কাছাকাছি গাড়িটা পার্ক করে দুজনে নেমে এলাম। মামুর বয়স আশি-ছুঁইছুঁই; কিন্তু অদ্ভুত শরীরের বাঁধুনি। যোগাসন করা পেটানো মেদবর্জিত শরীর। মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটেন। কখনও লাঠি ব্যবহার করেন না। অথচ আজ দেখি উনি গাড়িতে উঠলেন একটা শৌখিন হাতির দাঁতের মুঠ-ওয়ালা ছড়ি হাতে। যদুবাবুর বাজারের কাছে গাড়ি থেকে নেমে লাঠি ঠুক-ঠুক করতে করতে রীতিমতো কুঁজো হয়ে ফুটপাতে উঠে গেলেন। আমি গাড়ি লক করে ওঁর কাছে এগিয়ে এসে জানতে চাইলাম, মাজায় কি একটা ফিক ব্যথা হয়েছে?

উনি ফিক করে হেসে বললেন; না তো!

—তবে এমন কুঁজো হয়ে হাঁটছেন কেন?

—তুমি গিরীশ মহাপাত্রকে চেন?

গিরীশ মহাপাত্র! নামটা কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে, ঠিক ধরতে পারছি না। মামু বললেন, গিরীশবাবুর দু হাতই সমান চলত। ডান-বাঁ দুহাতে টিল ছুঁড়ে তিনি আম পাড়তে পারতেন।

এতক্ষণে মনে পড়েছে, পথের দাবীর সব্যসাচী।

মামু বললেন, রেঙ্গুনের একটি বিশেষ অঞ্চলে তিনি কেন খুঁড়িয়ে চলতেন, জানো?

বললাম, জানি। কিন্তু যদুবাবুর বাজারের মানুষজন কি আপনাকে লাঠি-ঠুক-ঠুক থুথুড়ে বুড়ো হিসাবে চেনে?

—না, চেনে না। তবে আমার এ আচরণেরও নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে। এটাও কিন্তু একটা কু। ভেবে দেখো। ধরোতো আমার বাঁ-হাতটা।

এ-বি-সি ব্যাক্সের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সেটা দিয়ে—ঠিকই বলেছিলেন কুণ্ডুমশাই—ওঁর বাড়িতে পৌঁছাতে দেড় মিনিট লাগার কথা। তবে অথর্ব বৃদ্ধের অভিনয়রত বাসুমামুকে নিয়ে সে বাড়িতে পৌঁছাতে আমাদের পুরো তিন মিনিট লাগল।

বাইরে কোনো কলবেল নেই। ফটোগ্রাফির দোকানের সাইনবোর্ডটা কিন্তু আছে। জোরে-জোরে বেশ কয়েকবার কড়া নাড়তে হল। অনেকক্ষণ পর ভিতরে হুড়কো খোলার শব্দ। দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার ফ্রেমে যে লোকটা এসে দাঁড়াল সে নিঃসন্দেহে : বক্ষিম রায়।

জানতে চাইল—কী চাই?

—কুণ্ডুমশাই আছেন? বাসুমামুর সরল প্রশ্ন। জবাবটা জানাই ছিল। তিনি কখন ফিরবেন সেটা বক্ষিম বলতে পারল না। তবে ওই সঙ্গে প্রশ্ন করল, কেন খুঁজছেন তাঁকে?

পকেট হাতড়ে একটা রসিদ বার করে মামু বললেন, একটা রিল ডেভেলপ করতে দিয়েছিলাম। আজই ভেলিভারির ডেট। কাজটা হয়েছে কি?

বক্ষিম হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। বলল, একটু অপেক্ষা করুন। আমি খুঁজে দেখছি।

সে ভিতরের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ করতেই মামু আবার বলেন, এক গ্লাস ঠান্ডা জল খাওয়াতে পারো ভাই?

ছেলেটি চটপট জবাবে বলল, পারি। ফ্রিজের জল?

না, না, অত ঠান্ডা নয়। তবে কাঁসার গ্লাসে এনো না যেন। অনেক সময়

তাতে আঁশটে গন্ধ লেগে থাকে। আমি আবার নিরামিষ খাই তো—গলা দিয়ে আঁশটে জল নামতে চায় না।

ছেলেটি বললে, কাচের গ্লাস তো নেই, স্টেনলেস স্টিলের গ্লাস হলে চলবে?

বাসু-মামু বললেন, কী দরকার? আমার ব্যাগেই কাচের গ্লাস আছে। রস; বার করে দিই। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো, ভাই?

বঙ্কিম সপ্রতিভের মতো বললে, কী যে বলেন দাদু? আমি তো আপনার নাতির বয়সী।

মামুর ব্যাগের মধ্যে যে ঝকঝকে একটা ইয়ারা কাচের গ্লাস ছিল তাও আমার অজানা। তবে এবার ওঁর উদ্দেশ্যটা কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তার কি কোনো প্রয়োজন ছিল? বঙ্কিমকে সন্দেহ করার কোনো হেতু নেই। তার অপরাধের মধ্যে সে চৌখস, কাজের ছেলে, আর হ্যাঁ—সে-ই ‘বর্তমান’ পত্রিকার বিজ্ঞাপনটা কুণ্ডুবাবুকে প্রথম এনে দেখায়। সেটা তো নিতান্ত ঘটনাচক্রেও হতে পারে। তাই জন্য এভাবে কায়দা করে বঙ্কিমের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করার কোনো মানে হয়? বাসু-মামুর সবেতেই বাড়াবাড়ি। ওঁর বাঁধা বুলি “যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার ফর্মুলা অব অ্যাটম বম্ব।”

অল্প পরে বঙ্কিম সেই ঝকঝকে গ্লাসে একগ্লাস ঠান্ডা জল নিয়ে এল। মামু তা ঢকঢক করে গিলে তোয়ালে জড়িয়ে আবার ব্যাগে পুরলেন।

প্রত্যাশিত ভাবেই বঙ্কিম সেই কাগজের নম্বর মিলিয়ে কোনো ফটোর এনভেলোপ খুঁজে পেল না। মামু বললেন, আমার বরাত। ঠিক আছে, পরে এসে খোঁজ করব। কাল তো রোববার। পরশু আসব।

আমরা ঘর ছেড়ে পথে নামতেই বঙ্কিম দরজাটা ড্রাম করে বন্ধ করে দিল। আমরা বড় রাস্তার দিকে ফিরে চলি। হঠাৎ মামু বললেন, কৌশিক, ওই পাঁচিলে একটা ভাঙা ইটের ফোকর রয়েছে। ওইখানে ঠ্যাঙ রেখে উঁকি মেরে ভিতরটা একবার দেখো তো।

এ তো আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! কুণ্ডুবাবুর বাড়িটা বড়রাস্তার সামনের দিকের ব্যাঙ্কের একবারে লাগোয়া। মানে এ বাড়ির পূর্ব দিকের পাঁচিল আর ব্যাঙ্কের পশ্চিমপ্রান্তের পাঁচিল হচ্ছে ‘কমনওয়াল’। তার ওপাশে একটা পূব-পশ্চিম লম্বা খুব সরু কানা-গলি। ফুট-চারেক চওড়া।

সম্ভবত কর্পোরেশনের আইন মোতাবেক ফাঁক রাখা হয়েছে। উনি আমাকে দেখতে বলছেন সেখানে কী আছে। আচ্ছা তোমরাই বলো—কী থাকতে পারে সেখানে? হারানো মানিক? না অ্যাটম বোমা বানানোর ফর্মুলা? সে কথাই বলি, ওখানে আবার কী থাকবে? ছাই-পাঁশ, কাঁঠালের ভূতি : ডাবের খোলা, আধলা ইট। আর কী থাকবে বলে আশা করছেন আপনি? মরা বেড়ালের ছানা?

—না, মানে আমি দেখতে চাইছি, ওই গলিতে জমির লেভেল কি এই রাস্তার চেয়ে উঁচুতে না নিচুতে।

আমি বললাম, কেন? আপনি কি এখানে ড্রেন বানানোর কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন কর্পোরেশন থেকে?

ঠিক তখনি দুজন লোক ঢুকে পড়ল গলিতে। তাদের পিছন-পিছন এক জোড়া রাস্তার নেড়িকুত্তা।

মামু বললেন, ঠিক আছে দেখতে হবে না। দেরি হয়ে গেছে। এখন পাঁচিলে পা দিয়ে দেখতে গেলে কুকুরে কামড়ে দেবে। এস, গাড়িতে যাওয়া যাক।

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, পাঁচিলের ও-পাশে কী দেখতে চাইছিলেন বলুন তো?

উনি বললেন, সে কথা থাক। তুমিই বরং বল তো, এক নজরে বন্ধিমের কী দেখলে?

—কী আবার দেখব? বন্ধিম ঠিক বন্ধিমের মতো দেখতে, তাই দেখলাম।

—কী কী নজর করেছ তুমি?

—বয়স : ত্রিশ-বত্রিশ, হাইট পাঁচ ফুট ছয় বা সাত; ওজন : ষাট কে জি হবে। রঙ কালো, চশমা নেই, গোঁফ দাড়ি নেই। গায়ে স্যাভো গেঞ্জি আর পরনে ময়লা পায়জামা। কেন, আপনি কি তার বেশি কিছু দেখেছেন?

মামু বললেন, দু-দুটো আসল জিনিসই তুমি লক্ষ্য করনি : ওর স্যাভো গেঞ্জিটা ভেজা ছিল, আর ওর পায়জামায় হাঁটুর কাছটা।

—হাঁটুর কাছটায় কী? ছেঁড়া? শেলাই করা? তাম্বি মারা?

—না। ... ময়লা লেগেছিল।

—ছিল তো ছিল, সেজন্য ওর আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করার কোনো মানে হয় না।

মামু হাসতে হাসতে বললেন, এই তো বুদ্ধি খুলেছে! কে বলে ‘সুকৌশলী’ কৌশল জানে না! সুকৌশলীর মাথায় ঘিলু নেই। কিন্তু কী কাণ্ড

হয়েছে জানো কৌশিক? গ্লাসে ওর আঙুলের কোনো ছাপই পড়েনি! বন্ধিম ছোকরা আমার চেয়েও খলিফা। গামছা দিয়ে মুছে গ্লাসটায় জল ভরেছে। তারপর গামছা জড়ানো হাতে বসিয়েছে একটা কাচকড়ার ডিশ-এর উপর ডিশ ধরে নিয়ে এসেছে। বিচ্ছু ছেলে!

—আপনি কী করে বুঝলেন যে, ও গামছা দিয়ে মুছে নিয়েছিল গ্লাসটা?

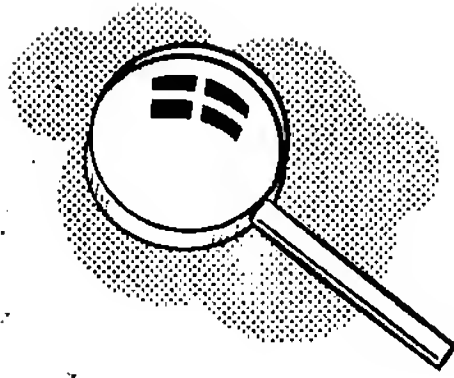
—কী করে বুঝলাম সে কথা থাক, কিন্তু ও যখন ডিশ-এর উপর গ্লাসটা জলটা নিয়ে এল তখনই কিন্তু আমার অঙ্কের শেষ স্টেপটা আমি কষে ফেলেছি! দ্য প্রবলেম ইজ ফাইনালি সলভড।

—কেমন করে? আপনি বলতে চান সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সব, স—ব সমস্যার?

—একজ্যাক্টলি! ‘সর্বশুভ্র সঙ্ঘ’ সংক্রান্ত সব কয়টি কন্টক সমুখে উৎপাটিত হয়ে গেছে। মাথায় কিঞ্চিৎ ঘিলু থাকলে এটা তুমিও বুঝতে পারতে!

স্বীকার করছি। অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি : আমি কিছু বুঝিনি। তোমরা বুঝেছ? সব স-ব সমস্যার সমাধান হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে এখানে একটা পেজ-মার্ক দাও। গল্পটা আর পড়তে হবে না। আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলো দিকিন! এ পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে সেই সূত্র ধরে সব কটা সমস্যার সমাধান একটা কাগজে লিখে ফেলো। এক : কারা, কেন আট-দশ হাজার টাকা জলে দিয়ে কুণ্ডুবাবুকে নিয়ে অমন কিঙ্কিন্ধ্যা-নাচ নাচাল? দুই : বাসুমামু কেন গিরীশ মহাপাত্রের ঢঙে খোঁড়াতে শুরু করলেন? তিন : কেন বন্ধিমের গেঞ্জি ভেজা থাকা অথবা পায়জামার দুহাটুতে ময়লা লেগে থাকা সমাধানের ইঙ্গিত দিল? চার : মামু কেন ওই কানাগলির ভিতর কী-আছে তা আমাকে দেখতে বলেছিলেন?

ওই চারটি প্রশ্নের উত্তর যদি খুঁজে পেয়ে থাক তাহলে—দিদিভাই/দাদাভাইয়ের দল—এই বুড়ো মানুষটার একটা উপদেশ শোনো : গোয়েন্দা গল্প আর তোমাকে পড়তে হবে না। ফালতু সময় নষ্ট! তার চেয়ে বরং এখন থেকে গোয়েন্দা গল্প লিখতে শুরু করে দাও। কি জানো? বাঙলা কিশোর সাহিত্যে ভালো গোয়েন্দা গল্পের বড় অভাব। টিসম-টিসম মারপিটের রহস্য কাহিনি নয়—বুদ্ধির বিচারে খাঁটি স্মার্ট গোয়েন্দা কাহিনি।



সেই শনিবারই রাত তখন সাড়ে দশটা। এ.বি.সি ব্যাঙ্কের পাশেই একটা নামকরা সিনেমা হাউস। সেখানে এখন নাইট-শো সিনেমা চলছে। বাসু-মামুর নির্দেশ-মতো ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় পঞ্চাশ-মিটার দূরত্বে একটা মারুতি সুজুকি গাড়ির পিছনে আমাদের ফিয়াট গাড়িটা পার্ক করলাম। মামুর নির্দেশ মতোই এবেলা আমার হিপ-পকেটে একটা লোডেড রিভলভার। মামুও—আমি জানি—তাঁর পকেটে নিয়ে এসেছেন ছোট্ট একটা পিস্তল। এ বেলা তিনি সোজা হয়ে হাঁটছেন। লাঠির দরকার হচ্ছে না।

আমরা গাড়ি থেকে নামতেই অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে এল একজন পুলিশ-অফিসার। ব্যাঙ্কে বোধহয় ইনস্পেকটর। বললে, গুড-ইভনিং, স্যার! ওঁরা ব্যাঙ্কের ভিতর ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। আসুন আপনারা।

ব্যাঙ্কের প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে যেতেই সশস্ত্র দ্বারপাল স্যালুট করল। কোল্যাপসিবল গেটটা একটু খুলে দিল। ভিতরে কোথাও আলো জ্বলছে না কিন্তু। সার্জেন্ট একটা টর্চের আলোয় আমাদের পৌঁছে দিল ম্যানেজার-সাহেবের ঘরে। সে ঘরেও আলো-পাখা চালু নেই। তবে এয়ার-কন্ডিশনারটা চলছে। রাস্তার আলো জানলার ভিতর দিয়ে আসায় ঘরটা বেশ আলো-আঁধারি। ঘরে ইতিপূর্বেই উপস্থিত হয়েছেন তিন জন। ম্যানেজারের চেয়ারে বসে আছেন মিস্টার ভার্গব। তাঁর সঙ্গে দুপুরে অনেক কথা বলে গিয়েছিলেন বাসু-মামু, আমার উপস্থিতিতেই। তাঁর ডানদিকে যিনি বসে আছেন তিনিও আমার পরিচিত। ক্যালকাটা পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ নিখিল দাশ। মামুর গুণগ্রাহী ও স্নেহধন্য। আর ম্যানেজারের বাঁ-পাশে আমাদের অপরিচিত একজন বৃদ্ধ। ভার্গব-সাহেবই পরিচয় করিয়ে দিলেন—উনি হচ্ছেন ডক্টর ওয়াই রামস্বামী, এ.বি.সি ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর। কলকাতারই বাসিন্দা।

বাসু-সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি ইংরেজিতে বললেন, আপনার নাম আমি অনেকবার শুনেছি; ব্যারিস্টার সাহেব। চাম্ফুস দেখা হল আজ। আপনার নানান কীর্তি-কাহিনিও আমার জানা। তাই ভার্গব-মারফত আহ্বান পেয়েই রিভলভার পকেটে ছুটে এসেছি। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো?

বাসু বলেন, বলছি। তার আগে সমঝে নিই যে, আমার নির্দেশমতো সব ব্যবস্থা ঠিক ঠিক হয়েছে কি না। নিখিল, তুমি ও মুখটা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছ তো?

নিখিল দাশ বলে, ইয়েস স্যার। একের-তিন সতীশ পতিতুও লেনের পাশেই আছে একটা কানা গলি। ফুট-চারেক চওড়া। পাঁচিল দিয়ে আড়াল করা। সেখানে লুকিয়ে আছে দুজন সার্জেন্ট আর তিনজন কনসটেবল। ও বাড়ি থেকে কাউকে ছুটে পালাতে দেখলে ধরতে হবে। প্রয়োজনে গুলি করার অর্ডারও তাদের দেওয়া আছে। এ ছাড়া বড় রাস্তার মোড়েও আছে আমার জিপটা। তাতেও আছে একজন শার্প শ্যুটার।

বাসু বললেন, গুড! আর আমি যে একজন মাসল-ম্যান চেয়েছিলাম...

নিখিল জবাব দিল না। নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়ল : ভীম সিং।

তৎক্ষণাৎ অন্ধকার থেকে আধা-আলোয় এগিয়ে এল একটি দানবমূর্তি। উচ্চতায় ছ ফুট তিন ইঞ্চি হবেই। সেই অনুপাতে চওড়া আর হাতের কজি। লোকটার পরনে পুলিশের পোশাক। সে সসম্ভ্রমে স্যালুট করল।

বাসু-মামু তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আগে বক্সিং লড়তে?

লোকটা লজ্জা পেয়ে বললে, নেহি সার, ফ্রি-স্টাইল কুস্তি। দারা সিং থে মেরা গুরুজি!

নিখিল দাশ বলে ও বর্তমানে ক্যালকাটা পুলিশের কুস্তি চ্যাম্পিয়ন।

—কখন বদমাসটাকে পাকড়াতে হবে তা তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তো কমিশনার সাহেব?

—জি!

—ঠিক হয়। অব তোম যা সেকতে হো!

রামস্বামী জানতে চান, এবার বুঝিয়ে বলুন স্যার, এই ‘রাদেভুঁ’র অর্থ কী? কোথায় কোন বদমাশকে পাকড়াবে ভীম সিং?

মামু নিখিল বাবুকে বলেন, কুণ্ডু-মশায়ের অভিজ্ঞতার কথা ওঁকে এখনও বলোনি? নিখিল জবাব দেবার আগেই রামস্বামী বলে ওঠেন; হ্যাঁ,

বলেছেন। ইন ডিটেইলস। কিন্তু কোন এক পতিতুণ্ড সেকেন্ড বাই লেনের একজন লোককে কারা বাঁদর নাচ নাচিয়েছে বলে আপনার-আমার মতো সজ্জনকে কেন এভাবে রাত জাগতে হবে?

বাসু প্রতিপ্রশ্ন করেন; ওই একের তিন সতীশ পতিতুণ্ড সেকেন্ড বাই লেন বাড়িটা কোথায় জানেন?

—একজ্যাক্ট লোকেশানটা জানি না। ভার্গব বলল, ব্যাঙ্কের পাশে যে বড় রাস্তা আছে সেখান দিয়ে গেলে ফার্স্ট লেফট-হ্যান্ড লেনটাই হচ্ছে সেই রাস্তা। কিন্তু কেন? সে বাড়ির লোকেশানটা কেন ইম্পর্টেন্ট।

—যেহেতু সেই বাড়িটার পূর্বের দেওয়াল আর আপনার ব্যাঙ্কের পশ্চিমের দেওয়াল হচ্ছে ‘কমন-ওয়াল’। যেকোনও কারণেই হোক ওই বাড়ির মালিক ব্যাঙ্কে তাঁর জমি বিক্রি করেননি। আপনাদের আর্কিটেক্ট তাই ওই দোতলা বাড়ির দেওয়ালের দু-পাশে দুটি আর সি.সি, পিলার গাঁথে ব্যাঙ্কের দেওয়ালের ওজনটা নেবার ব্যবস্থা করেছেন।

রামস্বামী বাধা দিয়ে বললেন, এসব এঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক্যালিটিজের প্রশ্ন উঠছে কেন?

—যেহেতু ওই দোতলা বাড়ির বনিয়াদ মাত্র দেড় মিটার গভীর!

—বুঝলাম না। মানে, বুঝলাম। সো হোয়াট?

—আপনি কি এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে, ওই অ্যান্টিসোসাইালের দল কুণ্ডু বাবুকে কেন প্রায় হাজার চারেক টাকা দিয়েছে? কী তাদের মূল উদ্দেশ্য?

—নো স্যার! সেটাই বা কেন?

—একটাই উদ্দেশ্য ছিল তাদের। কুণ্ডুবাবুকে বেলা দশটা থেকে ঘণ্টা-চারেক বাড়ির বাইরে নজরবন্দি করে আটকে রাখা। সেই সময়ে তাঁর বাড়ির ওই ডার্করুম থেকে একটা এক-মিটার গভীর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে আপনার ব্যাঙ্কের ভূগর্ভে চলে যাওয়া। আপনার ব্যাঙ্কে ওইখানে বাইরের দিকে কোনো পাঁচিল নেই। লোড বহন করছে গ্রাউন্ড-লেভেলে একটা আর সিসি বিম আর দুপাশের দুটি কলাম। ফলে ওরা সুড়ঙ্গ কেটে ভল্টের ভিতর সহজেই ঢুকতে পারবে। বাইরে আপনাদের নানান বজ্র-আঁটুনি। কিন্তু মাটির নিচে আছে ফসকা-গেরো! আপনারা সেটা খেয়াল করেননি, ওরা করেছিল।

এ সময়ে আমি বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলাম। সুড়ঙ্গটা কাটত কে? বন্ধিম?

—আবার কে? একা হাতে দেড়-মাসে সে সুড়ঙ্গটা কেটে ফেলেছে।

—তাহলে মাত্র চার ঘণ্টার জন্যে কুণ্ডুবাবুকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হল কেন? হোয়াই নট দশটা-পাঁচটা?

—তুমি একটা জিনিস ভুলে গেছ, কৌশিক। টানেল কাটতে হলে অনেক রাবিশ উঠে আসে—মাটি আর ভাঙা ইট। তা বন্ধিমকে গুছিয়ে রাখতে হত ওই সঙ্কীর্ণ ডার্করুমে। রাত গভীর হলে সেই রাবিশ র্যাশন-ব্যাগে ভর্তি করে দু-বাড়ির পাশে যে গলিটা আছে সেখানে ফেলে আসত। তাই আমি দেখতে চেয়েছিলাম, সেই গলির গ্রাউন্ড-লেভেল কতটা উঁচু। দশটা-পাঁচটা সুড়ঙ্গ কাটলে যে মাটি উঠত তার জায়গা হত না ওইটুকু ঘরে।

এতক্ষণে আমি একটু একটু বুঝতে পাচ্ছি। কেন মামু বলেছিলেন—বন্ধিমের ভিজ়ে গেঞ্জি আর হাঁটুর ময়লা এ সমস্যা সমাধানের কু। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে সে সদরে ছড়কো দিয়ে হাঁটু গেড়ে সুড়ঙ্গ কাটছিল তখন। গেঞ্জিটা ঘামে ভেজা ছিল। আমি আরও বুঝতে পারলাম কেন সকালবেলা উনি অথর্ব বুড়ো সেজে ছিলেন। লাঠি দিয়ে রাস্তার বিভিন্ন অংশে ঠুকে ঠুকে দেখতে—কোনো ফাঁপা শব্দ হয় কি না।

ভার্গব জানতে চায়, কিন্তু আজ রাত্রেই যে ওরা ভল্টে ঢুকবার চেষ্টা করবে এটা কী করে আন্দাজ করলেন?

—শুধু আজ রাত্রে বলিনি, মিস্টার ভার্গব। আমার ফোরকাস্ট : আজ রাত্রি সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। প্রথম কথা : আমি যে কিছু একটা সন্দেহ করেছি এটা ওরাও বুঝতে পেরেছে। ফলে এটা ওদের তরফে ‘শুভস্য শীঘ্রং’। রাত এগারোটা দশে নাইট শো শেষ হবে। সাড়ে এগারোটার মধ্যে সবাই চলে যাবে। পাড়াটা হয়ে যাবে সুনসান। তারপর ওরা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে চাইবে না—রাত ভোর হবার আগে যতটা বেশি সময় পাওয়া যায় আর কি। আর আজ কেন? যেহেতু কাল রবিবার। ভল্টে কেউ আসবে না। ওরা অনেকটা সময় পাবে পালাবার।

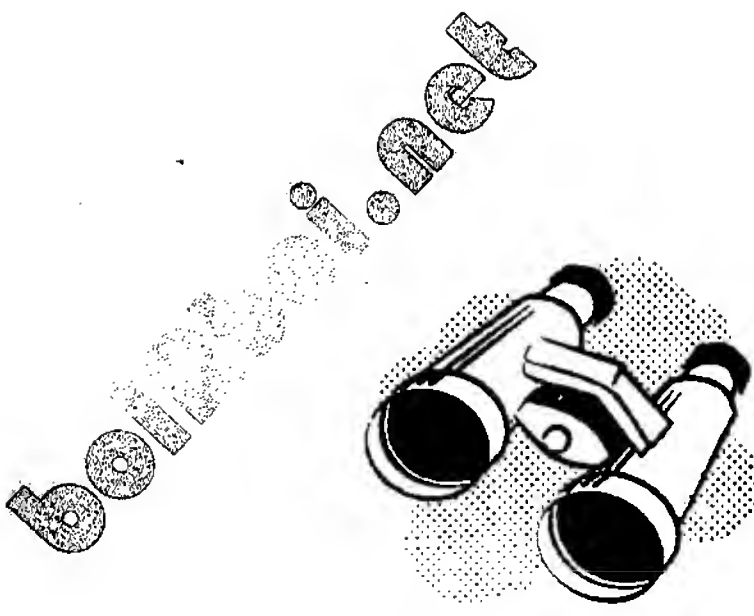
নিখিল ঘড়ি দেখে বলল, রাত এখন এগারোটা পাঁচ। সময় আর বেশি নেই, স্যার। আপনি এই ‘অপারেশন র্যাট এনকাউন্টার’টার ছক কীভাবে কষেছেন, বলুন এবার।

—মিস্টার ভার্গব আন-আর্মড। উনি এই ঘরেই থাকবেন। হট-লাইনে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। বাকি আমরা পাঁচজন ভল্টে নেমে অপেক্ষা করব। পাঁচখানা চেয়ারে দেওয়াল ঘেঁষে বসে থাকব। মেঝে ফুঁড়ে প্রথম স্যাঙাৎটি যেই মাথা তুলবে আমি তার মুখে টর্চের আলো ফেলব। ভীম-সিং তৎক্ষণাৎ তার উপর বাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরবে। আর তুমি তার হাতে হ্যান্ডকাপ পরাবে। একই সঙ্গে কৌশিক ঘরের আলো জ্বলে দেবে। নিখিল আর কৌশিক দুজনেই রিভলভার রেডি করে রেখ। ভীম সিং-এর হাত ফসকে লোকটা পালাবার চেষ্টা করলেই তোমরা ফায়ার করবে। প্রেফারেবলি পায়ে। এনি কোশ্চেন?

রামস্বামী বললেন, ইয়ে হয়েছে! আমার রিভলভারের লাইসেন্স আছে বটে, নিয়েও এসেছি কিন্তু জীবন কখনও ছুঁড়িনি। আমার রিভলভারটা নিয়ে ভার্গবই বরং ভল্টে যাক। আমি এই কন্ট্রোল-রুমে হট-লাইনের দায়িত্বটা নিচ্ছি। এটাই শক্ত কাজ!

মামু বললেন, সেক্ষেত্রে আমরা চারজন ভল্টে নেমে যাব। মিস্টার ভার্গব অ্যান্ড ডক্টর রামস্বামী এই ঘরে থাকুন। হ্যাঁ, সওয়া এগারোটা বেজে গেছে। সিনেমা হল-এ নাইট শো ভাঙল বোধহয়। লেটাস মুভ-অন।

boirboi.net



এর পরের অধ্যায়টা নিছক :টিসম, টিসম! জানি না, তোমাদের তা পড়তে ভাল লাগে কি না, আমার বাপু লিখতে একটুও ভাল লাগে না। যা হোক, তবু গল্পটা তো শেষ করতে হবে :

এ.বি.সি ব্যাক্সের ভূগর্ভস্থ ভল্টে চারখানা চেয়ার পেতে আমরা বসেছিলাম। একটা চেয়ার অবশ্য ফাঁকা। সাহেবদের সঙ্গে ভীম সিং চেয়ারে বসতে রাজি হল না কিছুতেই। সে বসেছে মাটিতে। আসনপিঁড়ি হয়ে।

বাসু-মামু টর্চের আলোয় মেঝের মোসেইক টালিগুলো পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, খান-তিনেক টালি আলাগা অবস্থায় আছে। অর্থাৎ নিচে থেকে ঠেলা দিলে সেগুলি উঠে আসবে। বোঝা গেল, এই পথেই আসবেন স্যাঙাতের দল।

এই ভূগর্ভস্থ ভল্টটা নীরব্র অন্ধকার। টর্চ নিবিয়ে দেবার পর আমরা নিজেদের হাতখানাও দেখতে পাচ্ছি না। ঘণ্টাখানেক এভাবেই সবাই নিশ্চুপ বসে আছি। পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ শুরু হল খুব হালকা একটা শব্দ। যেন স্যাকরার হাতুড়ির ঠুকঠুক আঘাত। মিনিট-খানেক পরেই মেঝেতে একটা আলোর আভাস। আমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। একটু পরেই একখানা টালি যেন আড়ামুড়ি ভেঙে পাশ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোর ঝলক। ভূগর্ভ থেকে সিলিং-এ পড়েছে। পরক্ষণেই তার পাশের টালিখানা ও পাশে সরে গেল। আর ভূগর্ভ থেকে উঠে এল একটা হাত। তারপরেই আর একটা হাত। দু হাতে ভর দিয়ে পাতালরাজ্য থেকে উঠে এল একজন আগন্তুক—তার গায়ে স্যাভো গেঞ্জি, পরনে পায়জামা, মাজায় রিভলভার। লোকটা উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল বাসু-মামুর টর্চ। লোকটা প্রতিবর্তী প্রেরণায় চোখটা ঢাকল। আর তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীমবেগে—কুস্তি-চ্যাম্পিয়ন ভীম সিং। আমি লাফ দিয়ে উঠে ঘরের

আলোর সুইচটা জ্বলে দিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, লোকটাকে পিছন থেকে জাপটে ধরেছে ভীম সিং। নিখিল লাফ দিয়ে পড়েছে তার ওপর। মুহূর্ত মধ্যে লোকটার হাতে স্টেনলেস স্টিলের হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিয়েছে।

সুড়ঙ্গের নিচে আর যারা ছিল তারা রুদ্ধশ্বাসে পিছন দিকে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে। হতভাগাগুলো জানে না ব্যূহের ও-প্রান্তে পতীক্ষা করছে রিভলভার হাতে দুজন সার্জেন্ট।

ঘটনার আকস্মিকতায় পাতাল-ফুঁড়ে উঠে আসা লোকটা রীতিমতো হকচকিয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে। দু-মাস ধরে যে স্বর্ণময় রাজ্যের স্বপ্ন দেখে ঘর্মের স্রোতে ধারাস্নান করেছে সেই রাজ্যেই সে এসে পৌঁছেছে—কিন্তু কারেন্সি নোটের ঝকঝকে বাডিলে সে হাত ছোঁয়াতে পারছে না—তার হাতে স্টেনলেস স্টিলের ঝকঝকে বালা।

নিখিল বললে, সরি ইউসুফ! শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়ে গেলে তাহলে?

আমি বলি, ইউসুফ কে? ও তো বক্কিম?

নিখিল হাসতে হাসতে বলে, শ্রীকৃষ্ণের মতো ওরও অষ্টোত্তর শতনাম আছে। পাটনায় ও হচ্ছে মগনলাল, দিল্লিতে ইসমাইল, কুণ্ডু মশায়ের দোকানে ও স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট কিন্তু লালবাজারে সবাই ওকে ইউসুফ নামেই চেনে। তাই না বক্কিম?

বক্কিম তার মাথাটা তুলতে পারে না।

পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমরা সবাই জমিয়ে বসেছি। আমি জানতে চাইলাম, আপনি ঠিক কখন বুঝতে পারলেন মামু—গোটা পরিকল্পনার ছকটা?

বাসু-মামু কফি পটে চামচ নাড়তে নাড়তে বললেন, ওই যে কাল বললাম—বক্কিম যখন ডিশের উপর কাচের গ্লাসটা বসিয়ে আমাকে জল খেতে দিল।

—কিন্তু কী করে?

—কালই তো বললাম সে-কথা! ও অতি ধূর্ত! নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্লাসে পড়তে দিল না। কিন্তু কেন? একমাত্র উত্তর হতে পারে, ও জানে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট লালবাজারের ফাইলে সযত্নে রাখা আছে। তাতেই ও চূড়ান্তভাবে প্রমাণ দিল যে, সে একজন পাক্ষা ক্রিমিনাল। গ্লাসে যদি ওর

ফিঙ্গারপ্রিন্ট পড়ত তাহলে আমাকে অনেকটা সময় নষ্ট করে খুঁজতে হত। এখানে তা হল না। একেই বলে, “নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে? কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।” এ ধাঁধার অনেক রকম সল্যুশান হয়। যেমন গ্লাসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই, তাই আমি সমাধানটা পেয়ে গেলাম; তার আগে গৃহস্বামী গৃহে নেই, তাই বন্ধিম সুড়ঙ্গ কাটার সুযোগটা পাচ্ছে। আবার দেখো, সর্বশুভ্রসজ্জের অস্তিত্বই নেই অথচ কুণ্ডুবাবু সেখান থেকে সপ্তাহান্তে মাইনে পাচ্ছেন। কিংবা মাথায় ঘিলু নেই, তবু মিঠুর বাবা দিব্যি করে খাচ্ছে।

মিঠু আজকাল দু-একটা কথা বলতে পারে। সে হঠাৎ হাততালি দিয়ে খিলখিলিয়ে ওঠে; বাবা-মাতায় ঘিলু নেই—বাবা বুকু খাচ্ছে! কী মজা কী মজা!”

আমি অর্ধভুক্ত বিস্কিটটা প্লেটে নামিয়ে রাখলাম। আচ্ছা, তোমরাই বলো, এটা কি বাসুমামা অন্যায় করছেন না? এভাবে মেয়ের সামনে বাপের লেগপুলিং? ‘বাবার মাথায় ঘিলু নেই’ এসব কী অসভ্যতা শেখানো হচ্ছে অতটুকু মেয়েকে?

